দ্বিতীয় বর্ষ ॥ দ্বাদশ সংখ্যা
কার্ত্তিক ॥ ১৩৮১
October '74

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - সুজিত কুণ্ডু
স্ক্যান করেছেন - সুজিত কুণ্ডু
এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার কোন বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা নিজে স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেইল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

Approved by the Directorate of Public Instructions, West Bengal as a Children's Monthly Magazine. Vide No. 109 (16) T. B. C. *Dated 15. 8. '78.*

কলরব

সূচিপত্র

দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা
অক্টোবর ১৯৭৯, কার্তিক ১৩৮৬

কেন ভুলে যাও (কবিতা)
শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ঘোষ ৫৬৭

মজার ছড়া (ছড়া)
সুধীর কাব্যশ্রী ৫৬৮

বিলকুল রাম হ্যায় (কবিতা)
ফণিভূষণ বিশ্বাস ৫৬৮

আজব প্রতিশোধ (হাসির গল্প)
শ্রীঅশোকবরণ চক্রবর্তী ৫৬৯

শুদ্ধ প্রেম (গল্প)
মায়া ঘোষদস্তিদার ৫৭৬

সুরথ উদ্ধার (গল্প)
প্রফুল্ল হোড়রায় ৫৭৮

নতুন প্রতিবেশী (গল্প)
অধ্যাপক শ্রীঅমল মিত্র ৫৮২

আজব দেশ (নাটক)
শ্রীরবিদাস সাহারায় ৫৮৪

টুনটুলির মা (গল্প)
রঞ্জিত ভট্টাচার্য ৫৯২

টারজানের বিচিত্র কাহিনী (ধারাবাহিক)
পার্থসারথি ৫৯৩

অরণ্যের সন্ধানে (গল্প)
অমিয়কুমার চক্রবর্তী ৫৯৮

আমার দেশ আমার গর্ব (নিবন্ধ)
শ্রীধর মুন্সী ৬০৫

মস্তান শর্মা (কবিতা)
শ্রীঅদ্বৈত মল্লিক ৬০৩

মুক্তাচয়ন
শ্রীগোপাল ভৌমিক ৬০৪

কর্ম (কবিতা)
কেকা মুখোপাধ্যায় ৬০৪

সম্পাদক : শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সরকার কর্তৃক বি-৪ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত
মুদ্রাঙ্কন ৭৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে মুদ্রিত।

দাম : ১·০০ টাকা

'কলরব' এর নূতন বছর

বাংলার অগণিত শিশু, কিশোর ও তাদের অভিভাবকদের শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ নিয়ে 'কলরব' আগামী অগ্রহায়ণ মাসে তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করবে। 'কলরব' যে সকলের মনোরঞ্জন করতে পেরেছে, ক্রমবর্ধমান চাহিদাই তার প্রমাণ। আগামী বছরে যাতে 'কলরব' আরও জনপ্রিয় হয় তার যথাসাধ্য আয়োজন করা হচ্ছে। গল্প, কবিতা, ছড়া, ধারাবাহিক উপন্যাস, চিত্রকাহিনী, রূপকথা, ভৌতিক কাহিনী, টারজানের গল্প, ইতিহাসের কাহিনী, খেলাধূলা, মজার ধাঁধা প্রভৃতি সবরকম আকর্ষণীয় বিষয়ই কলরবে থাকবে।

আগামী বছরের প্রধান আকর্ষণ বর্তমান কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের ধারাবাহিক চিত্রকাহিনী **পুতুলের লড়াই** এবং পরলোকগত শিশুসাহিত্য-সম্রাট হেমেন্দ্রকুমার রায়-এর ধারাবাহিক উপন্যাস **ঐন্দ্রজালিক**। (উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দিরের সৌজন্যে প্রাপ্ত)।

তাছাড়াও শিবরাম চক্রবর্তী, খগেন্দ্র মিত্র, ধীরেন্দ্রলাল ধর, মনোজিৎ বসু, বনফুল, অন্নদাশঙ্কর রায়, আশাপূর্ণা দেবী, ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত, বিমল মিত্র, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, আশা দেবী, রবিদাস সাহারায়, মায়া ঘোষদস্তিদার, বিশু মুখোপাধ্যায়, সংকর্ষণ রায়, স্বপন বুড়ো, মৌমাছি, বেলা দেবী, অমরনাথ রায়, হাসিরাশি দেবী, বন্দে আলি মিঞা, বেণু গঙ্গোপাধ্যায়, পিনাকীরঞ্জন কর্মকার, শান্তশীল দাশ এবং আরও অনেকে লিখবেন।

নিপুণ শিল্পীদের আঁকা ছবিতে এবং সুন্দর প্রচ্ছদপটে আগামী বছরের 'কলরব' শিশু ও কিশোর মহলে আশাকরি আনন্দের কলরব তুলবে।

কলরব

সম্পাদক : শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিতীয় বর্ষ ঃ বর্ষসূচী

(অগ্রহায়ণ ১৩৮০—কার্তিক ১৩৮১)

বিষয়		লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
অ			
অদ্ভুত প্রাণী ইকিদ্‌না	(প্রবন্ধ)	মাধব পাল	৫৫৮
অবাক ভাড়াটে	(হাস্যকৌতুক)		৮৭
অবিশ্বাস্য	(ভৌতিক গল্প)	মুরারিমোহন বিট	১৯১
অভিমানই ক্ষোভ দুঃখের কারণ	(গল্প)	বিনয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য	৫৫৫
অরিন্দম কাহিনী	(ডিটেকটিভ গল্প)	নির্মল সরকার	২৮৯
অলীক রাজ	(গল্প)	গোরাচাঁদ পাল	২৫৬
অষ্টবসু কোম্পানী	(গল্প)	সুমথনাথ ঘোষ	২৪১
অরণ্যের সন্ধানে	(গল্প)	অমিয়কুমার চক্রবর্তী	৫৯৮
আ			
আগমনী	(কবিতা)	বেণু গঙ্গোপাধ্যায়	৫২২
আচ্ছা বেকুব	(হাসির গল্প)	বিশ্বপ্রিয়	২৮২
আজব দেশ	(নাটক)	রবিদাস সাহারায়	৪১৪, ৫১০, ৫৪৩, ৫৮৪
আজব দুর্ঘটনা	(বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প)	সুস্নাত গঙ্গোপাধ্যায়	১১৮
আজব প্রতিবেশী	(হাসির গল্প)	শ্রীঅশোকরঞ্জন চক্রবর্তী	৫৬৯
আমরা	(ছড়া)	অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৩২৮
আমাদের সত্যেন্দ্রনাথ	(জীবন কথা)		১৬২
আমার অচেনা বন্ধু	(হাসির গল্প)	শিবরাম চক্রবর্তী	৪২১
আমার খুকু	(কবিতা)	বেলাদেবী	৪
আমার দেশ আমার গর্ব	(নিবন্ধ)	শ্রীধর মুন্সী	৫১, ১০৩, ১৫৭, ২১৬, ২৭১, ৩১৭, ৩৬৬, ৪১২, ৪৫৮, ৫১২, ৫৫৯, ৬০৫

বিষয়		লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
আমি যাত্রী : কায়রো	(ভ্রমণ)	সুশীলকুমার গুপ্ত	৩১৬
আনো আলো	(কবিতা)	সলিল মিত্র	২২৮
আশ্বিনে	(কবিতা)	নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়	৫১২
উ			
উপদেশের দাম	(মারাঠি লোককথা)	অমরনাথ রায়	২৯৬
এ			
এক কন্যাই চালাক	(গল্প)	তমাল চট্টোপাধ্যায়	৭৪
একেই বলে রানওভার	(হাসির গল্প)	বগলা যোগশর্মা	৩৪০
এ কোন্ দেশ	(কবিতা)	সুধীর কাব্যশ্রী	৬০
এনডারসনের গল্প	(জীবনী গল্প)	অজয় বসু	১২৪
ও			
ওরা খুনী	(গল্প)	সুভাষ ঘোষাল	৮৪
ওরা যেমন আসে তেমনি যায়	(গল্প)	তবেশ সেনগুপ্ত	৪৩৪
ক			
কর্ম	(কবিতা)	কেকা মুখোপাধ্যায়	৬০৪
করিম চাচা	(কবিতা)	কে, এম, সমশের আলি	৪
কলরব	(কবিতা)	মনোজিৎ বসু	৫৯
কলরবের দেশ	(কবিতা)	সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৩২৭
কবিরায় বীরবল	(জীবন কথা)	রাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী	৫০১
কাটাকাটি	(ছড়া)	সুনীতি মুখোপাধ্যায়	২২৮
কাঠবেড়ালিকে	(ছড়া)		৪৭৬
কি থেকে কি হয়	(প্রবন্ধ)	শচীপতি রায়	১৮৫
কূট-বাণিজ-জাতক	(জাতকের গল্প)	বিমলেন্দু চক্রবর্তী	৬১
কেন ভুলে যাও	(কবিতা)	অপূর্বকৃষ্ণ ঘোষ	৫৬৭
খ			
খুশীর খেলাঘর	(কবিতা)	পিনাকীরঞ্জন কর্মকার	১৭২
খেলাধূলা		মুকুল দত্ত ৫৩, ১০৯, ১৬৬, ২১১, ২৭৮, ৩২৪, ৩৬৯, ৪১৫, ৪৬৯, ৫১৭, ৫৮০	

বিষয়		লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
গ			
গরীব কাঠ-খোদাইকারের ছেলে	(কাহিনী)	খগেন্দ্রনাথ মিত্র	৫
গল্প লেখার গল্প	(সত্য কাহিনী)	চুনীলাল রায়	৩০৪
চ			
চল্ যাই জাদুঘর	(কবিতা)	গোপাল ভৌমিক	১১৬
চাঁদা	(হাসির গল্প)	বিশু মুখোপাধ্যায়	৩২৯
চেনো কেউ	(কবিতা)	দুর্গাদাস সরকার	৬০
চোরেরও অধম	(গল্প)	খগেন্দ্রনাথ মিত্র	৫২৩
ছ			
ছবি আঁকিয়ে	(কবিতা)	সুনীল চক্রবর্তী	৩
জ			
জলসা	(ছড়া)	ফণীন্দ্রনাথ দাস	৩৭৪
জীবনের কত রঙ	(গল্প)	কেয়া রায়	৩৪৭
ট			
টান	(গল্প)	অমিয়কুমার চক্রবর্তী	৯৬
টারজানের বিচিত্র কাহিনী	(ধারাবাহিক)	পার্থসারথি ৯৮, ১৫৩, ২০৯, ২৬৮, ৩২২, ৩৬৪, ৪০৫, ৪৫৫, ৫০৪, ৫৫২, ৫৯৩	
টুনটুনির মা	(গল্প)	রণজিৎ ভট্টাচার্য	৫৯২
টেলিফোন	(গল্প)	নির্মলেন্দু গৌতম	৭০
ঠ			
ঠিক দুপুরের আকাশ-কুসুম	(গল্প)	স্বপন বুড়ো	৩৭৫
ড			
ডাইনীর বন	(রূপকথা)	মল্লিকা চ্যাটার্জী	৫৫১
ডালুমাসির ডাল	(হাসির গল্প)	অশোক সী	১২০
তিন কিশোরের কাণ্ড	(হাসির গল্প)	স্বপন বুড়ো	১৭৯
তিনটি প্রশ্ন	(গল্প)	স্নেহেন্দু মাইতি	৩৩৪

বিষয়		লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
দ			
দশে মিলে	(গল্প)	বেলা দেবী	৫২৭
দানের মহিমা	(কবিতা)	সলিল মিত্র	৩৭৩
দেবী আবাহন	(কবিতা)	শান্তশীল দাশ	৫২২
ধাঁধা	৫৬, ১১২, ১৬৮, ২২৪, ২৮০, ৩২৬, ৩৭২, ৪৬৪, ৫২০, ৫৬৬		
ন			
নতুন প্রতিবেশী	(গল্প)	অমলকুমার মিত্র	৫৮২
নমস্কারের ভঙ্গি কত	(মজার প্রবন্ধ)	গৌরী রায়	২০৪
নির্ভীক	(কবিতা)	সুখরঞ্জন রায়	৪৭৫
নীল গগনের স্বপ্ন	(গল্প)	দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৯২
প			
পরীর দেশের রেলগাড়ী	(বিদেশী রূপকথা)	আর্যভট্ট	১৪৩
পাওয়ার হাউসের এন্টনী সাহেব	(ভৌতিক গল্প)	চিত্তরঞ্জন রায়	৪০৯
পাতাল রেল	(ছড়া)	বিমানকুমার দত্ত	১১৭
পিকনিক	(কবিতা)	বেণু গঙ্গোপাধ্যায়	১৭১
পুরনো ছবি	(গল্প)	খগেন্দ্রনাথ মিত্র	৩৮৯
প্রধান মন্ত্রী নির্বাচন	(রূপকথা)	মনোজিৎ বসু	১৭৩
প্রিন্স ও পার্সী	(রহস্য কাহিনী)	জয়দেব রায়	৩৫৪
প্যাকপেকিয়া	(গল্প)	অমলকুমার মিত্র	৪০৩
ব			
বাইসনের পাল্লায়	(শিকার কাহিনী)	শেফালি রায়	২৩৪
বামাক্ষেপার ভিটে	(ভ্রমণ কথা)	তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫
বিজ্ঞানের আজব কাহিনী		সবজান্তা	৩৪, ৮৮, ১৪৮, ২০৬, ২৭৫, ৩৫৯, ৪০০, ৫০৮, ৫৪২
বিজ্ঞানের বাইরে	(ভৌতিক গল্প)	মৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়	২৩৬
বিপ্লবের অগ্নিশিখা	(ঐতিহাসিক কাহিনী)	হাসিরাশি দেবী	৪৭, ৯১, ১৮৭, ২৫০, ৩০০, ৩৪২, ৩৮৬, ৪১৯, ৪৯৬, ৫৩৫

বিষয়		লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
বিলকুস রাম হায়	(কবিতা)	কণিভূষণ বিশ্বাস	৫৬৮
বীরত্বের পুরস্কার	(ঐতিহাসিক গল্প)	মুকুলদেব ঠাকুর	২৮
বুড়োবুড়ি	(ছড়া)	সুনীল ভট্টাচার্য	২৭
বুবুল ও পাখীরা	(গল্প)	অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ	১০৭
বেঁচেছিল শুধু একজন	(গল্প)	অতীন মজুমদার	৫৩৯
বোতলের দৈত্য	(বিদেশী রূপকথা)	ধীরেন্দ্রলাল ধর	৪৮৮

ভ

ভিখারী বিদায়	(সত্য ঘটনা)	ডাঃ বি. দে	১০১
ভুতুরে আঙুল	(ভৌতিক গল্প)	নটরাজন	২৮৩
ভূত বাংলোর একটি রাত	(ভৌতিক গল্প)	অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৫
ভো-কাট্টা—ভো-কাট্টা	(গল্প)	স্বপনবুড়ো	৪৭৭

ম

মজার ছড়া	(ছড়া)	সুধীর কাব্যশ্রী	৫৬৮
মজাদার ভোজ	(ছড়া)	শান্তশীল দাশ	১৭২
মরা মানুষের সঙ্গে	(ভৌতিক গল্প)	অমিয় পাল	৫৩১
মস্তান শর্মা	(কবিতা)	শ্রীঅদ্বৈত মণ্ডল	৬০৩
মিনি আর টিনি	(গল্প)	সুতপা চক্রবর্তী	৩০
মিঠুন আর টুনটুনি	(গল্প)	সতীরঞ্জন আদক	১৩৩
মুদগল ঋষির উপাখ্যান	(পৌরানিক গল্প)	ধীরেন্দ্রলাল ধর	৩৬২
মুক্তাচয়ন	(সংগ্রহ)	শ্রীগোপাল ভৌমিক	৩৭১, ৬০৪
মৃতাহারী দেবাবতার	(পৌরাণিক গল্প)	সিদ্ধার্থ মৈত্র	৪৩৮
মেঘলা রাত	(কবিতা)	মোহন মিত্র	৪২০

র

রামচন্দ্রের স্বপ্ন	(ভ্রমণ)	শেফালি রায়	৪৩২
রাশিয়ার প্রথম গুরু	(জীবন কথা)	আর্য ভট্ট	৩৮২
রুমনি-ঝুমনির গল্প	(রূপকথা)	শারীন্দ্রকুমার ঘোষ	২৪৮

বিষয়		লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
রূপান্তর	(ধারাবাহিক উপন্যাস)	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	২১, ৭৭, ১৫৮, ২০০, ২৬৪, ৩০৭, ৩৩৭, ৩৯৬, ৪৫৩, ৪৮৫
লটারী হলো কবে থেকে	(সংগ্রহ)		৪৪০
শ			
শরৎ বুঝি আসে	(কবিতা)	পিনাকীরঞ্জন কর্মকার	৪৭৬
শিবে ডাকাতের গল্প	(গল্প)	ধীরেন্দ্রলাল ধর	৩৭
শীতের ছড়া	(ছড়া)	বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	১১৭
শুনতে অবাক লাগে	(পুরনো কথা)		৩৬৩
শুদ্ধ প্রেম	(গল্প)	মায়া ঘোষ দস্তিদার	৫৭৬
স			
সপ্তভিঙা	(কবিতা)	পরিমল ভট্টাচার্য	১২৭
সশরীরে স্বর্গ লাভ	(বিদেশী গল্প)	মঙ্গলময় দত্ত	২১৯
সৎসঙ্গে স্বর্গবাস	(গল্প)	বিনয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য	৩৪৬
সুরথ উদ্ধার	(গল্প)	প্রফুল্ল হোড়রায়	৫৭৮
সেকালের কলকাতা	(জানবার কথা)		১৩২
সেদিন রাতে	(গল্প)	রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	৪৪৯
স্মরণীয় যারা	(জীবন কথা)	মঞ্জুশ্রী চক্রবর্তী	২১৩
হ			
হতাশ না হয় নাইবা হলে	(সত্য কাহিনী)	অমলকুমার মিত্র	১৫১
হাতিমপুরের হাতি	(ছড়া)	নিশিকান্ত মজুমদার	৪২৩
হাসতে চাও কি		গৌরী রায়	২৯৫
হাসতে চাও তো হাসো		হাসুবাবু	৩৫৮
হাসাহাসি	(ছড়া)	শুভেন্দু ঘোষ	৩২৮

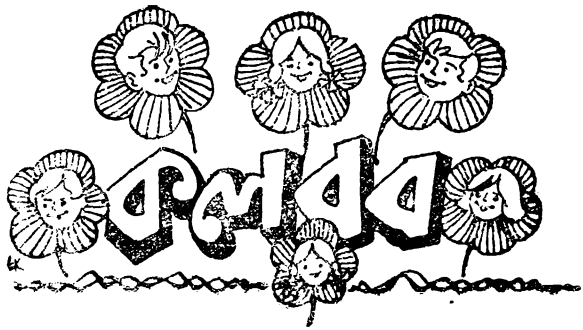

২য় বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা, অক্টোবর, ১৯৭৪ ঃ কার্তিক, ১৩৮১

কেন ভুলে যাও?

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ঘোষ

ত্রিশে আশ্বিন ছিল একদিন
রাখী বাঁধিয়াছি হাতে,
হিঁদু, মুসলিম, খৃষ্টান সবে
বসিয়াছি একসাথে।
ভাই-ফোঁটা দিনে দেশের যতেক
হিঁদু কি মুসলমান,
সবারে জড়ায়ে বুকে টেনে নিয়ে
করিয়াছি প্রেমদান।
জন্মেছি মোরা নানা দেশে বটে,
তবু মোরা সবে ভাই,
যাশু কি আল্লা, হরি কি বুদ্ধ
একই পিতা ভুল নাই।
আমার বাড়ীতে চীনাম্যান এসে
বাংলা যদি না বলে—
সেই অপরাধে ছুরি কি বসাতে
হবেই তাহার গলে?

তুমি শিক্ষায় পড়েছ পিছিয়ে,
আমি চলে গেছি আগে—
সেই ঈর্ষায় আমার বুকেতে
ছুরি কি বসাবে রাগে?
ধর্মের নামে খুনোখুনি করে'
সাজিয়াছি সবে বোকা,
আজ গদী নিয়ে খুনোখুনি—সে যে
বোকামির নামে ধোঁকা।
সন্তান মোরা মানুষের—সেই
কথাটি রাখিয়া মনে
মিলেমিশে আজ কর দেখি কাজ
ভাইবোন এক সনে।
তবেই বুঝিব তোমার ভিতরে
জেগেছেন ভগবান—
স্বার্থ-পিশাচ মরে গেছে—আর
পালিয়েছে শয়তান॥

মজার ছড়া

সুধীর কাব্যশ্রী

ভাত খাই মাছ খাই
খাই রুটি ডাল।
দুধ খাই চিনি খাই
খাই টক্ ঝাল।
খাই আমি চম্‌চম্
ঘিয়ে-ভাজা লুচি।
আম জাম কুল খাই
মুখে আছে রুচি,
চিড়ে মুড়ি দই খাই
বসে আমি ঘরে,
বেল লেবু আনারস
খাই মজা করে।
খেলে আমি খুশী হই
পাকা পাকা কলা,
কেঁদে ফেলি খেলে আমি
বকা, কানমলা।

বিলকুল রাম হ্যায়

ফণিভূষণ বিশ্বাস

কেনারাম কাহারের কারবার ক্যানিং-এ,
বোম্বের বেচারাম ওস্তাদ ট্যানিং-এ।
শিলুয়ার লোহারাম কবে গেছে লামডিং?
জানে না তা' রামদীন, রামলাল, রামসিং।
তবে কেটে তবলায় তাল ঠোকে তুলারাম
সীয়া রাম সীয়া রাম গান গায় ভোলারাম;
হেঁছুয়ার কাছে থাকে হাঁদারাম মালাকার,
বজবজে বাস করে বাবুরাম কাঙ্কার।
মাৎ করে মণিরাম মজাদার রগড়ে,—
সকুরাম ঝকুরাম থাকে রামনগরে।
ফ্যালারাম, খেলারাম, কুড়োরাম, রামফল,
সবে মিলে রামপুরে খুলিয়াছে চাল কল।
হরেরাম বাস করে বলরাম লেনেতে,
রামগতি রামশিঙা ফুকেছিল ট্রেনেতে।
শ্রীরামপুরেতে এসে ক্ষুদিরাম গুহরায়,—
বলে ভাখো প্যালারাম বিলকুল রাম হ্যায়।

॥ আজব প্রতিশোধ ॥

শ্রীঅশোকবরণ চক্রবর্তী

পটলের 'পট-পটি' খাবার লোভে সেই সুদূর পটলডাঙা ষ্ট্রীট থেকে ছুটতে ছুটতে 'পটলবাগান'-এর বিরাট এক পটলবাগানের মালিক পটল মুখুজ্যের বাড়ীতে গিয়ে শুনলুম, পটলবাবু আজ দিন পনের হল পটল তুলেছেন।

'পটলবাবু' বলা হয়তো আমার ঠিক হচ্ছে না; কেন না, উনি হলেন গিয়ে আমার দাদামশাই। তবুও বলছি—বাধ্য হয়েই বলছি। চিঠি লিখে উনি হাজার বার জানিয়েছেন—'ভাই পঞ্চু (আমার নাম—শ্রীমান পঞ্চানন্দ প্যারিয়াল), আমার বাগানে ভীষণ পটল ফলছে। তুমি যে-রকম পটল-ভক্ত, তাতে এখানে এসে দিব্যি কয়েকদিন কাটিয়ে দিতে পার। ইচ্ছে করলে, পটলের সঙ্গে পেটাপেটিও লাগিয়ে দিতে পার।' ঐ চিঠি পড়েই না আমি তিন হপ্তার মধ্যেই বেরিয়ে পড়ে ছুটতে ছুটতে—মানে সেই ট্রেনের উপর উঠে ছোটা—এখানে এসে হাজির। পটল তোলার আর সময় পেলি না তুই? আমি এলে পর পটল তুলতে পারতিস। যখন তখন তুললেই হল আর কি, তোলবার কি আর দিনখ্যান নেই, এঁ্যা?

দাদামশাই পটল তুললেও পটলগাছগুলো তা তোলেনি এখনো। তুলবেই বা কেন, পটলগাছ হয়ে পটল তুলতে পারে কোন দিন? নিজের ছেলেকে কি কেউ কোন দিন জোর করে অক্কা পাইয়েছে, না পাওয়ায়?

আমার আফসোসের কারণ হল, এই শোকাবহ ব্যাপারের পর আমাকে কি আর প্রাণ খুলে পটল খাওয়াতে পারবেন ওঁরা? দাদামশাই আমাদের বাড়ীতে গিয়েছিলেন এই সেদিন, তাই আমার অবস্থাটা বুঝতেন খুব। এখন তিনিই নেই, কে যত্ন করবেন আর আমায়? মামারা তো এখনো সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতিস্থ হতে পারেন নি। আর বছরদশেক পরে পরপারে গেলেই ভাল করতেন দাদামশাই—এইটাই বলছেন ওঁরা।

যাক, কথায় বলে, গতস্য শোচনা নাস্তি। খামোকা দুঃখ করে লাভ নেই। এখন দেখি, কদ্দর কি ঘটে।

ছোটমামীমা আমাকে নিয়ে গিয়ে একেবারে রান্নাঘরে বসিয়ে দিলেন। বেলা তখন চারটে, গরম ভাতের আশা করা নেহাৎ বোকামি। জলঢালা ভাতই পেলুম, সেইসঙ্গে পেলুম—আলুভাতে, ডাল-চচ্চড়ি আর মাছের ঝোল। একখানা পটলের টুকরোও দেখতে পেলুম না কোথাও। একটু বিরক্ত হয়ে আড়চোখে তাকাতে লাগলুম হাঁড়ির দিকে।

মামীমা বললেন, শুধু ভাত, যাহোক করে খা এখন। তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করলেন উনি, হ্যারে পঞ্চা, শ্রাদ্ধের সময় এলি নে কেন?

নেমন্তন্ন করেছিলে তোমরা!—রাগ করেই বলি আমি। হতেই চায় রাগ। শ্রাদ্ধের সময় দারুণ খ্যাট হয়েছে নিশ্চয়ই। সব বরবাদ হয়ে গেল একেবারে!

আমার কথা শুনে মামীমা অবাক হয়ে বললেন, সে কি রে, নেমন্তন্ন-পত্র পাস নি তোরা? তোর বড় মামা তো উপরি উপরি তিনখানা চিঠি ছাড়লেন। কাজের তাড়ায় কেউ যেতে পারল না। একটা চিঠিও পেলিনে তোরা!

ইচ্ছা করছিল, বলি, 'গা থাকলে পাঠাতে পারতে যাকে হোক। মামাত ভাই-এর অভাব নেই তো আমার। বাপ মারা গেলে মেয়েকে ভুজ্যি দিতে হয়, তাও তো দিতে পারল না মা!' কিন্তু বলতে পারলাম না। শুধুমুধু চটালে পরে পস্তাতে হবে হয়তো। তাই না—পাইনি বলে অন্য প্রসঙ্গে চলে আসি—এক আধখানা পটল ভাজা নেই হাঁড়ীতে?

পটলভাজা! মামীমা আকাশ থেকে পড়লেন যেন—তুই পটল খুব ভালবাসিস বুঝি? তা কি করে জানব, বল। আমাদের বাড়ীর কেউ তো পটল পাতে করতে চায় না। আচ্ছা, কাল তোর জন্যে পটল রাঁধব; দেখি, কত খেতে পারিস!

মামীমার কথায় সন্তুষ্ট না হয়ে পারি না। হাসিমুখে বলি, তুমি কিন্তু খালি খালি দাদামশায়ের নাম ধরছ, মামীমা!

কত আর মনে রাখি বল!—হেসে বলেন মামীমা।

ভাত-টাত খেয়ে মেজমামার ছেলে পিন্টুর সঙ্গে একটু বেড়াতে বার হলুম। আমারই বয়সী ও। গেল বছর বড়পুজোর সময় আমাদের ওখানে গিয়েছিল, তাই খাতিরটা আমাদের জমতে দেরি হল না বেশী। বলতে কি সেবারেই খাতির জমেছিল আমাদের—জমেছিল একটা সাঙ্ঘাতিক ঘটনার মাঝ দিয়ে—

মহাষ্টমীর দিন দুজনে বেরিয়েছি ঠাকুর দেখতে। ও তো আর আমাদের

ওখানকার রাস্তাঘাট চেনে-শোনে না, আমিই সব দেখাচ্ছি ওকে। ও-ও ভাল ছেলে সেজে দেখে-শুনে যাচ্ছে সবকিছু। হঠাৎ আমার নজর পড়ে গেল ওর পকেটের দিকে —একটা কাল মত কি রয়েছে যেন। ভাবলুম, নিশ্চয়ই কোনও খাবার-টাবার হবে; জিজ্ঞেস করলুম, কিরে তোর পকেটে?

রিভল্‌ভার।—উত্তর দিল ও।

রিভল্‌ভার। কই দেখি।—বললুম আমি।

ও বার করল অস্ত্রটা—'টয় পিস্টল'। 'টিপ-ফটকা'র একটা রিল পরানো ছিল ওটায়। পিণ্টু ট্রিগার টিপে দিতেই একটা শব্দ হল বেশ। আমি বললুম, আমাকে দে একবার, ফাটাই একটা।

ও কিছুতেই দেবে না, আর আমিও ছাড়ব না। শেষে একরকম জোর করেই ওর হাত থেকে নিয়ে নিলুম পিস্তলটা। পাশ দিয়ে একটা বাচ্চা ছেলে যাচ্ছিল। তার কানের কাছে ওটা নিয়ে গিয়ে দিলুম ট্রিগার টিপে। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গেই আওয়াজ হল—ফটাস! আর ছেলেটা ভ্যা ভ্যা করে এমন কান্না শুরু করল।

কি হল রে?—বলতে বলতে একটা মুস্‌কো চেহারার লোক রাস্তার ওদিক থেকে আসতে লাগল। গতিক খারাপ দেখে পিস্তলটা পিণ্টুর পায়ের কাছে ফেলে চোঁ-চাঁ দৌড় দিলুম। একবারের জন্যে ফিরেও তাকালুম না।

একটু পরে ছল্-ছল্ চোখে পিন্টু বাড়ীতে, অর্থাৎ আমাদের বাড়ীতে ফিরল। বিরাট একটা হাঁড়ীর মত মুখ ওর। কোন উপায়ে হাসি চেপে জিজ্ঞেস করলুম, কিরে, কি হল?

তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে একেবারে ভাজা হয়ে গেল ও—তোর জন্যেই আমার পাঁচসিকের পিস্তলটা চলে গেল। গালে চড় মেরে কেড়ে নিল ওরা।

ওরা কে, তা বুঝতে পারি, তবে একটু আশ্চর্য হয়ে গেলুম ওর কথায়। মুখে বিস্ময় ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, গালে চড় মেরেছে।

একটু অপ্রতিভ হয়ে ও বলল, চড় অবশ্য মারে নি। তবে হাত ধরে যা গজগানি দিয়েছে, না।

কে জানে, দয়াপরবশ হয়ে ওর পিঠেও দু'চার ঘা দিয়েছে, কিনা।

হ্যাঁ, সেই থেকেই খাতির, বা ভাব, বা ভালবাসা, বা অন্তরঙ্গতা, বা বন্ধুত্ব জমে উঠেছে আমাদের। আর উঠবে নাই বা কেন, মায়ের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে ওকে দুটো রসোগোল্লা কি ঘুস দিইনি আমি? ঘুস কিংবা ক্ষতিপূরণ—যাই হোক একটা হলেও দিয়েছি তো। নইলে মা হাজার বললেও ও পয়সাক'টা তো আমার পকেটেই ঢুকত, নয়তো বা অন্য কিছুতে রূপান্তরিত হয়ে সোজা পেটে গিয়েই আশ্রয় নিত। ওকে মিষ্টি খাওয়ানোর জন্যে মা আমাকে আলাদাভাবে দিয়েছিল ঐ পয়সাগুলো।

বেড়াতে বার হয়ে একটু খাতির করে, সেই কথাটা জেনেও জিজ্ঞেস করলুম আবার, হ্যারে তোর ঠাকুর্দার ছাদ্দে আমাদের নেমন্তন্ন করাল না যে বড়।

ও বলল, তোরা যদি না আসবি।

জিজ্ঞেস করলম, খুব খ্যাঁট হয়েছিল না রে?

নিশ্চয়ই!—চোখ পাকিয়ে বলল ও।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললুম, হ্যারে, তোদের বাগান-বাড়ীতে খুব পটল হয়েছে না? পটল খাবার জন্যেই এখানে এলুম কিন্তু।

বেশ তো, কাল সকালে তোতে আমাতে গিয়ে তুলে নিয়ে আসব। আন্তরিকতার সঙ্গেই বলল ও, এখন চ, ঐ ঝোপটার কাছে বসে গল্প করি।

নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে নরম ঘাসের ওপর আরাম করে বসে বললুম, তোদের এখানটা কিন্তু একদম গেঁয়ো জায়গা। চারদিকে বন, মাঠ আর বাগান। সিনেমা কি থিয়েটার, ম্যাজিক কি সার্কাস—এসবের টিকিও নেই এখানে।

হঠাৎ ওর চোখ দুটো জ্বলে উঠল বেড়ালের মত। বলল, খুব যে নিন্দে করা হচ্ছে আমাদের গ্রামকে। জানিস, আজ রাত্রে আমাদের এখানে জলসা হবে একটা। বিরাট জলসা, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় গান গাইবেন, বুঝেছিস ?

এ্যাঁ, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় আসবেন এখানে। আমার চোখ দুটো কপালে উঠে যায়—সত্যি বলছিস তুই ? সত্যি আজ হেমন্তবাবু গান গাইবেন এখানে ?

ওনার গাওয়া গান রেডিও, সিনেমা, রেকর্ড ইত্যাদিতে শুনেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ উনি গান গাইছেন, আমি শুনছি—এমন ঘটেনি কখনো। এই চর্মচক্ষু দিয়ে ওঁর চর্মাবৃত দেহটাকেও দেখিনি। সেই না দেখার দুর্ভাগ্যটা যদি আজ দেখার সৌভাগ্যে রূপান্তরিত হয়…

কিন্তু পিন্টু মিথ্যে বলছে না তো ?—না, আমার মাথায় হাত দিয়ে বলল ও, দেখ, আমি তোকে মিথ্যে কথা বলছি—এটা তুই মনে করতে পারলি ?

এক নম্বরের মিথ্যুক পিন্টু মাথায় হাত দিয়ে যদি কিছু বলে, তাহলে বুঝতে হবে, ও নির্ভেজাল সত্যি কথা বলছে। তাই আমি বারদুয়েক খাবি খেয়ে জিজ্ঞেস করলুম, টিকিট কত করে রে ?

পিন্টু বলল, ফার্স্টক্লাস—পাঁচ টাকা, সেকেণ্ড ক্লাস—তিন টাকা, আর থার্ড ক্লাস—দু'টাকা। যদি যাস তাহলে অন্তত সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কাটতে হবে, নইলে গান শুনতে পেলেও গায়ককে দেখতে পাবি না।

গান তো শুনেছি অনেক। আমার উদ্দেশ্য—প্রধান উদ্দেশ্য হল, গান শোনা নয়, গায়ক দেখা।

কিন্তু তিন টাকা বলছে যে। হোক গে, দেখাই যাক না একবার। পিন্টুকে বললাম, দেখ তিনটে টাকা দিয়ে না হয় দেখাই যাবে আর কি। তাহলে তুই তিনটে টাকা জোগাড় কর, তোর জন্যে।

আব্দার ধরে বসল ও—আমার থেকে বড় তুই, দাদা হোস আমার। আর আমার তল্লির খবর তো তোর অজানা নয়। মানে—

ওকে বাধা দিয়ে সোজাসুজি বলে দিই আমি, দু'টা টাকা আমি কেন, আমার দাদামশাই এলেও দিতে পারবে না।

কিন্তু নাছোড়বান্দা পিন্টুর পাল্লায় পড়ে অনেক কষ্টে বাধ্য হয়ে চার টাকা দেব বলে স্বীকার করলুম আমি। ও আর দুটো টাকা দিয়ে দু'খানা সেকেণ্ড ক্লাসের

টিকিট কাটবে বলে কথা দিল। তক্ষুণি বিদেয় হল ও; বলে গেল, আগে গিয়ে পরিচালনার ক্লাব থেকে দুটো টিকিট কিনে আনি। ম'টায় শুরু হবে জলসা, টিকিট পাওয়া দায় হয়ে উঠবে তখন।

চারটে টাকা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় মন খারাপ করে বসে রইলুম কিছুক্ষণ।

রাত আটটার সময় আমি আর পিন্টু খেয়ে-দেয়ে বার হলুম। দাদারা বা মামারা গেলেন না কেউ। পিন্টুকে জিজ্ঞেস করায় ও বলল, চুপ! জানাজানি হয়ে গেলে সব মাটি হয়ে যাবে শেষে।

তাই চুপচাপ ওর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লুম রাস্তায়। চাঁদের আলোয় চন-চন করে চলতে লাগলুম। একসময় জিজ্ঞেস করলুম ওকে, টিকিট নিয়েছিস তো?

ও মাথা নেড়ে সম্মতি জানালে বললুম, আমায় দে একখানা।

চলতে চলতে বলল ও, সেখানে গিয়ে দোব'খন।

আমার মাথায় হাত বুলিয়ে একটা টাকা মেরে আদায় করলি, এ্যাঁ!—একটু হেসে বললুম আমি।

পিন্টু রেগে গেল আমার কথায়, বলল, গেল বারে পুজোর সময় আমাকে কি রকম ফ্যাসাদে ফেলেছিলি, মনে আছে তো? আমার সেই পাঁচসিকে দামী পিস্তলটা খোয়া গেল তোর জন্যেই। আর একটা টাকা লোকসান যেতেই তুই কিনা গজগজ করছিস!

ভয় হয় ওর কথা শুনে। কোথাও নিয়ে গিয়ে দলবল জুটিয়ে মারবে নাকি? সাঙ্ঘাতিক ছেলে তো, সেই কতদিনের ঘটনা মনে করে রেখেছে। সত্যি, আমি সেই চাঁদের আলোয় চারদিকে সর্ষেফুল দেখতে লাগলুম। এখান থেকে ছুট দোব নাকি? কিন্তু পথঘাট যে সব অচেনা! ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম ওকে, আলোটালো দেখতে পাচ্ছি না কেন? মাইকও বা চুপ করে আছে কেন? কদ্দুর আর?

পিন্টু বলল, আর একটু দূরেই। এ তো আর তোদের মত পচা শহুরে জায়গা নয়, যে চারদিকে আলো আর চেঁচামেচির ছড়াছড়ি। এটা হল পটলবাগান, বুঝেছিস, পটলবাগান—পটলডাঙ্গা নয়।

আর কিছু বলবার সাহস পেলুম না আমি।

একটা ঘরের কাছে এসে থামলুম আমরা। এখানে কোথায় জলসা হবে?

বুঝতে পারলুম, চরম প্রতিশোধ নিতে পিন্টু নিশ্চয়ই আমায় কোনও আড্ডাখানায় নিয়ে এসেছে। প্রতিবাদ করার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলেছিলুম তখন।

আমাকে নিয়ে ও ঢুকল ঘরটার মধ্যে। আঃ বাঁচলাম, এটা কোন গুণ্ডাপার্টি নয়—গানবাজনা পার্টিই। বেশ কতকগুলো ছোকরা এবং বুড়ো বসে আছেন। জন তিনেক মধ্যবয়সীও রয়েছেন সেখানে। একটা মাদুরের ওপর ডিগি-তবলা আর হারমোনিয়াম রয়েছে। গোটা দুই হ্যারিকেন জ্বলছে।

এই জলসাঘর? এখানে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় আসবেন গান গাইতে!

একটা চাটাই-এর ওপর বসল পিন্টু, আমিও বসে পড়লাম ওর পাশেই। এক-জন মধ্যবয়সী গর্দভ রাগিণীতে শুরু করলেন একখানা গান।

চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলুম পিন্টুকে, হেমন্তবাবু এসেছেন?

দেঁতো হাসি হেসে পিন্টু বলল, উনিই তো—

বাধা দিলুম আমি—কক্ষণো না। হেমন্তবাবুর অনেক ছবি আমি দেখেছি নানান পত্রিকায়।

দেঁতো হাসিটাকে সারা মুখমণ্ডলে ছড়িয়ে ও বলল, কই আমাদের পটল বাগানের হেমন্ত মুখোপাধ্যায়-এর কোনও ছবিই তো বার হয়নি কোন পত্রিকায়।

আমার চারটে টাকা তাহলে—কথা আটকে গেল মুখে।

মুখের হাসিটা পিন্টুর সারাদেহে ছড়িয়ে গড়ল।

পরদিন ভোরের ট্রেনেই রওনা হলুম পটলডাঙ্গার উদ্দেশ্যে—পটলের 'পট-পটি'র আশা ত্যাগ করেই।'...দুর্জনেন স্থানং ত্যজেৎ।'

শুদ্ধ প্রেম

মায়া ঘোষ দস্তিদার

১০ বছরের ছেলে ফ্র্যাঙ্ক্। মা বাবা তার ছিল না, মাসী মেসো তাকে দেখা-শোনা করতো, ছেলেটির সবকিছু ভালো ছিল শুধু তার খুঁৎএর মধ্যে একটা পা খোঁড়া ছিল। তার জন্য ইস্কুলের বেশির ভাগ ছেলেমেয়েরা তাকে ঠাট্টাবিদ্রূপ করতো। লেখাপড়ায় খুব ভালো ছিল ফ্র্যাঙ্ক। তাই মাষ্টাররা ভালোবাসতো ওকে। কিন্তু মিথ্যে মিথ্যে করে ফ্রাঙ্কের নামে নালিশ করতো ছেলেরা মাষ্টারের কাছে। ইস্কুল ছুটি হলে মাঝে মাঝে শাস্তি পেত ফ্র্যাঙ্ক। সব্বার ছুটি হয়ে যেত, ফ্র্যাঙ্ক একা একা হলে দাঁড়িয়ে থাকতো খোঁড়া পা-টা নিয়ে। ফ্রাঙ্কের মাসী খোঁজ করতে আসতো, মাপ চাইতো মাষ্টারদের কাছে। ফ্র্যাঙ্ক কিন্তু যেতে রাজী হোত না, বলতো আমার বিনা অপরাধের শাস্তি, আমার ভোগ করতে হইবে, তবে ঈশ্বর আছেন, তিনিই আমার বিচার করবেন। ঈশ্বর আমায় খোঁড়া করেছেন, আমার সব ভার তাঁর উপর, এসব সুন্দর কথাবার্তা শুনে মাষ্টাররা বেশ একটু চিন্তা করতেন ফ্র্যাঙ্কের সম্বন্ধে। মাসী কেঁদে কেঁদে ফিরে আসতেন।

ফ্র্যাঙ্ককে ভালোবাসতো একটি সুন্দরী মেয়ে ক্লেরা, ফ্র্যাঙ্কেরই বয়সী। ইস্কুল ছুটি হলে রোজ হাত ধরে পৌঁছে দিত ফ্র্যাঙ্ককে তার বাড়ীতে। চুপিচুপি আপেল বনে বসে বসে গল্প করতো, লজেন্স বিস্কুট খাওয়াতো। এর জন্যে অন্য ছেলেমেয়েরা চাইতো ফ্র্যাঙ্ককে আরো জব্দ করতে। ফ্র্যাঙ্কের মাসীকে নানা কথা লাগাতো। মাসী হাসতেন, রাগের বদলে খুশিই হতেন। ক্লেরা ছিল খুব স্পষ্টবাদী, সব সময় ফ্র্যাঙ্কের হয়ে জবাব দিত। এইসব নিয়ে ছেলেরা দল পাকিয়ে ছুটির সময় ফ্র্যাঙ্ককে খুব মারলো একদিন। দূর থেকে দেখতে পেল ক্লেরা, ছুটে গিয়ে হেড্ মাষ্টারকে ডেকে এনে দেখালো আর বললো, দেখুন, মানুষের উপর মানুষের অত্যাচার, বেচারী খোঁড়া বলে সবাই ওকে ঘৃণা করে, যখন তখন মারে, আপনাদের কাছে নালিশ করে, আবার আপনারা ওকে শাস্তি দেন; এর বিচার করবে কে?

দেখে-শুনে হতবাক্ হয়ে গেলেন হেডমাষ্টার। ফ্র্যাঙ্ককে যত্ন করে তুললেন। প্রত্যেকটি ছেলের বাড়ী বাড়ী দারুণ ভয় দেখিয়ে চিঠি পাঠালেন এবং ক্লেরাও ফ্র্যাঙ্ককে খুব আদর করে চকলেট খাওয়ালো। খুব দুঃখ হয়েছিল ফ্র্যাঙ্কের, ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললো।

পরের দিন ছেলেরা ক্লাসে ঢুকতেই, হেডমাষ্টার তাদের একঘণ্টা ক্লাসে দাঁড় করিয়ে রাখলেন। সবাই জব্দ হোল। কিন্তু একদিন একটা দুর্দান্ত ছেলে স্টেভ, প্রতিশোধ নিলো ক্লেরার উপর। ক্লেরা আর ফ্র্যাঙ্ক উইলো গাছের ছাওয়ায় বসে বিকেলে, খুব গল্প করছিল। ফ্র্যাঙ্ক বলছিল, ক্লেরা তুমি ছাড়া আমার আর আপন বলতে কেউ নেই, আমি খোঁড়া, কেউ আমায় ভালোবাসে না এক তুমি ছাড়া। ক্লেরা বললো, আমি তোমায় খুব ভালোবাসি, আমার মা-বাবাও তোমাকে ভালোবাসেন। এসব শুনতে পেয়ে—স্টেভ্ এক ধাক্কা মারলো ক্লেরাকে, উঁচু একটা টিলায় বসেছিল ওরা দুজনে, গড়িয়ে পড়লো ক্লেরা। দেখেই ফ্র্যাঙ্ক ছুটে গেল পাড়ায় খবর দিতে। ক্লেরার মা-বাবা ফ্র্যাঙ্কের মাসী আর প্রতিবেশীরা ছুটে এলো, শুনলো সব কথা। ক্লেরাকে দেখতে গিয়ে দেখলো সব শেষ, মাথায় আঘাত লেগে ক্লেরা মারা গেছে, কান্নাকাটি, পুলিশে খবর দেওয়া, এক নিমিষে হৈ-চৈ কাণ্ড। পুলিশের সামনে সবকিছু বললো ফ্র্যাঙ্ক, পুলিশ স্টেভ্কে খুঁজতে চললো।

সব শেষ হয়ে গেল। চোখের সামনে পৃথিবীটা অন্ধকার হয়ে গেল ফ্র্যাঙ্কের। কবর দিতে সংগে গেল ফ্র্যাঙ্ক খোঁড়াতে খোঁড়াতে। সবাই চোখের জলে ফিরে এলো, ফ্র্যাঙ্ক ফিরলো না। সমাধির পাশে বসে বসে সারারাত কাঁদলো ফ্র্যাঙ্ক। মাসী টেনে নিয়ে এলো, কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক রোজ এসে ফুল দিয়ে সমাধিতে বসে কাঁদতো। এখনও সে রোজ আসে, উইলোর ছায়ায় ক্লেরার সমাধিতে একরাশ টিউলিপ দিতে। ক্লেরা ভালোবাসতো টিউলিপের ঝাড়। আজও আমার চোখে ভাসে—ছোট ফ্র্যাঙ্কের সুন্দর করুণ মুখখানা।

সুরথ উদ্ধার

প্রফুল্ল হোড়রায়

কাজটা ভাল করিনি। ভাল করিনি কি বলছি—কাজটা খারাপই করেছিলাম। অথচ বোধ করি না করেও উপায় ছিল না। পণ্ডিতরা বলেন, যেমন করে পার সর্বদা আত্মরক্ষা করবে। এতে যদি ধনদৌলত এমন কি প্রিয় পরিজনকে ত্যাগ করতে হয় সেও-বি আচ্ছা।

আর এ ত সুরথ সুরথকে আমার প্রিয়-পরিজন বলা ব্যাকরণ ও অভিধানের ঘোরতর ব্যত্যয় না ঘটিয়ে সম্ভব নয়। অথচ আত্মরক্ষার তাগিদটা দিন দিন বাড়ছিলই—সুরথের দৌরাত্ম্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। আপনা হাত জগন্নাথ করে সুরথের ঘাড়েই সব দোষ চাপিয়ে দেওয়াও বোধ হয় ঠিক নয়—। সুতরাং ব্যাপারটা গোড়া থেকেই বলি। আমাদের সময় একটা নিদারুণ নিয়ম চালু ছিল—কান মলে মলে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া। হতো কি, কেউ পড়া না পারলে তার পরের যে জন পারত সে যে পারত না তাকে কান মলে, তাকে সরিয়ে তার জায়গায় গিয়ে বসত। এমনি করে কেউ বা শেষ থেকে শীর্ষে উঠত—কেউ বা নামত শীর্ষ থেকে শেষে। ব্যাপারটার মধ্যে বুঝি বা খানিকটা জান্তব উল্লাস ছিল—তাই কান মলে মলে শীর্ষে ওঠবার লোভেই নাকি অনেকে গিয়ে ক্লাসের শেষ প্রান্তে ভাল মানুষটির মত বসত।

অন্ততঃ সুরথ এই সন্দেহই করত আমার সম্বন্ধে। নইলে ইস্কুলের একেবারে লাগোয়া বোর্ডিংএ থেকেও আমি কেন গিয়ে একেবারে শেষ প্রান্তে বসব। অস্বীকার করব না—কান মলাটা প্রতীকী হলেও ওতে আমিও কিঞ্চিৎ আত্মপ্রসাদ যে লাভ না করতাম তা নয়। তবে কিনা—এ জগতে নিরবচ্ছিন্ন সুখ বুঝি কারও ভাগ্যে নেই। আমার ভাগ্যেও ছিল না। আমার ছাত্র জীবনের সুখের বিঘ্ন ছিল ঐ সুরথ।

আমি মানুষটি—খাঁটি বাঙালীর ঐতিহ্যবহনকারী ছেলেবেলা থেকে ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে পিলেজোড়া পেট নিয়ে নিতান্ত টিঙটিঙে হাড্ডিসার এক যামবক। আর

সুরথ সাঁই জোয়ান এক তরুণ—ওর বয়স অনুপাতে ওর বুদ্ধি ছিল অনেক বেশি। এ হেন সুরথের সঙ্গে দৈরথে আমার পারা ছিল অসম্ভব।

সুরথের আচার আচরণও খুব যে একটা অহিংস ছিল না নয়। হতো কি, আমি যদি ক্লাসে সারের আদেশে নিতান্ত কুইনিন গেলার মত মুখ করে ওকে একটা কানমলা দিতাম—ও তার উত্তরে গুণে গুণে সাতটা কান মলা দিত সার ক্লাস ছাড়লেই —এবং কর্মটি যে খুব নীরবে সমাধা করত তাও নয়। মোটামুটি ও ব্যাপারটিকে একটা উৎসবের রূপই দিত। সুরথের ঐ তাগড়াই হাতের কানমলা যে সুখকর ছিল না তা বলাই বাহুল্য। অবশ্য সারদের কাছে বলে দিলে সুরথ হয়ত সাময়িক ভাবে শায়েস্তা হত—কিন্তু তারপর—খেলার মাঠে বল মারবার ছুতোয় ও যে আমার জীবনান্ত ঘটাবে না—এমন কথা কেউ বলতে পারত না সুতরাং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে —নাকি পড়ে পড়ে কানমলা হজম করা ছাড়া আমার আর উপায় ছিল না।

এমন সময় পণ্ডিতমশাই ভারি একটা জ্ঞানগর্ভ শ্লোক পড়ালেন—বিনা পরাক্রম দিয়ে যা সিদ্ধ হয় না তা উপায় দিয়ে সিদ্ধ হয়—দেখ না কাকী (ন কাকার পত্নী নন—কাকের পত্নী) স্বর্ণসূত্র দ্বারা কৃষ্ণসর্পকে বধ করেছিল। কোন্ স্বর্ণসূত্র দ্বারা সুরথ-সর্পকে ব্যাপাদিত করা যায় এই প্রশ্নটাই আমার মনে বড় হয়ে দেখা দিল।

কি সব জ্ঞানের কথাই না পণ্ডিতরা লিখে গেছেন—যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধি ভবতি তাদৃশী—কিনা যার যেমন ভাবনা তার সিদ্ধিও তেমনই।

সেদিন সুরথের অত্যাচার বুঝি বা একটু বেশিই হল। তা তুমি যদি বিহারের রাজধানী ভারত বল তাহলে তোমার যে হক পাওনা বহু কানমলা এ ত জানা কথা। তবে সতীশ সার ত বহু নয় মাত্র পাঁচটা কানমলা বরাদ্দ করেছিলেন। এর জন্যেও সতীশ সারের দোষ দেওয়া যায় না। আর আমিও যদি একটু জোরেই কানমলা দিয়ে থাকি তার জন্যে আমাকেও কি খুব একটা দোষ দেওয়া যায়? হাতের কাজ ত আর সবটা সমান হয় না—। কিন্তু সুরথের সবই উল্টো। এসব সহজ পথে ও পা বাড়াবেই না। ও গোঁয়ার্তুমি করে আমাকে এ্যায়সা করে কান মলে দিল যে আমার কান দুটো একেবারে লাল হয়ে উঠল—বেদনায় টনটন করতেও লাগল।

হবি ত হ এর পরের ঘণ্টায় এলেন—আর কেউ নয় স্বয়ং মধুর সার। ইংরেজি পড়ান। একে ইংরেজি তাতে মধুর সার—আমরা ত ভয়ে জড়সড়। কি ধরেন—

কি না ধরেন কিছুই ঠিক নেই। ইচ্ছে হল ত একেবারে প্রিফেস থেকে ধরে বসলেন। বই যখন পাঠ্য—তখন সবটাই পাঠ্য। সুতরাং সবটাই পড়তে হবে এই ছিল তাঁর নির্দেশ। নির্ভেজাল পূতচরিত্র—আদর্শবাদী শিক্ষক। জীবনে নিজেও কখনো ফাঁকি দেননি—অপরে দিলে বিশেষতঃ ছাত্ররা দিলে সহ্য করতেন না। অত্যন্ত কড়া মানুষ। কোন কিছু একবার ধরলে বড় সহজে ছাড়তেন না।

সেদিনের পাঠ্য বিষয়ে একটি ইংরেজি শব্দ ছিল যার বাংলা প্রতিশব্দ গবেষণা। মথুরবাবু ছিলেন গবেষণার ভক্ত। তিনি সকলকেই বলতেন, গবেষণা কর। চন্দ্র-নারায়ণ অবশ্য আড়ালে আবডালে বলত—গবেষণা ত গো+এষণা—অর্থাৎ কিনা গরু খোঁজা। গবেষণা নিয়ে চন্দ্রনারায়ণের ঐ গবেষণা অবশ্য কেউ মথুর সারের কানে তুলোনি কখনো। তাহলে আর রক্ষে থাকত না।

এখন হয়েছে কি একে মথুর সার—তাতে আবার সেই ওঁর প্রিয় গবেষণা। আর যায় কোথায়? উনি ত একেবারে নেচে ওঠলেন।

শুরুতেই আবার গবেষণা সম্পর্কে তাঁর সেই বহুশ্রুত ভাষণটি দিয়ে সকলকেই এর গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত করে তুললেন। তারপর হঠাৎ সেই মোক্ষম প্রশ্নটি করে বসলেন। গবেষণা ইংরেজি কি?

সুরথ বসেছিল আমার সামনের বেঞ্চে—আমি ঠিক তার পেছনে। আমি বুঝলাম সেই বিধিনির্দিষ্ট সুবর্ণ সুযোগটি এসেছে। এবং এসেছে গবেষণার রূপ ধরে।

যা ভেবেছিলাম, মথুর সার এদিক-ওদিক বারকয়েক তাকিয়ে ঠিক সুরথকেই ধরে বসলেন, বলত, গবেষণা ইংরেজি কি?

গবেষণা, সার?

হ্যাঁ, গবেষণা।

গবেষণা সার—গবেষণা—সুরথ বিড়বিড় করতে লাগল। বলেছি ত আমি বসেছিলাম ঠিক পিছনে—। আমি যেন নিজের মনে সার ধরলে কি বলব—তার রিহার্সেল দেবার জন্যে বিড়বিড় করে—মথুর সার না শোনেন অথচ সুরথের কর্ণগোচর হয় এমনভাবে—একটি শব্দ আওড়াতে লাগলুম। সুরথ আমাকে যতই কান মলুক আমার বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে তার সংশয় ছিল না। সুতরাং আমার টোপ সে অতি সহজেই গিলে ফেললো।

কিরে গবেষণা ইংরেজি কি?

গবেষণা, সার? ডিজগবেষণ,—

ঘরের মধ্যে যেন সহসা এ্যাটমবোমা ফাটল।

ডিজগবেষণ! বলাই বাহুল্য—এই শব্দটিই আমি বারংবার মৃদু উচ্চারণে আবৃত্তি করছিলাম—কতকটা এইভাবে যে আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি যা উত্তর করব তারই রিহার্সেল দিচ্ছি।

ডিজগবেষণ! মথুর সার ত উত্তর শুনে খ। তারপর হুঙ্কার ছাড়লেন, চন্দ্রনারায়ণ বেত নিয়ে আয়—জোড়া বেত। ডিজগবেষণ! আমার সঙ্গে ইয়ার্কি। তারপর বেত এল এবং সুরথের ওপর তা অজস্র সহস্র ধারায় পড়তেও লাগল। বেত্রাধিক্য দর্শনে আমার হরিষে বিষাদ উপস্থিত হল। হরিষ—সুরথের লাঞ্ছনায়। বিষাদ—পাছে সুরথ বলে দেয় যে আমি বলে দিয়েছি বা বুঝতে পারে এতে আমার চালাকি আছে। তবে সুরথ বীর বটে, একেবারে সেই বন্দীবীর বান্দার মত—স্থির হয়ে বীর মরিল, না করি একটি কাতর শব্দ।

সুরথ অবশ্য মরেনি। সারাটা ঘণ্টা ধরে এই সুরথ উদ্ধার পালা চলল। পরের দিন সুরথকে জিজ্ঞেস করলাম, হাঁরে, সুরথ আমার কথা বলে দিলি নে যে?

তোর মত বোকা কিনা—তোর কথা বলে দিলে আরো মারতেন না, সার! সুরথের সপ্রতিভ উত্তর।

ভাগ্যিস সুরথ আমার মত বোকা নয়—নইলে হয়ত সেইদিনই মথুর সারের হস্তে দেহরক্ষা করতে হত। তবে সুরথ যে আমার মত নির্বোধ নয় তার নির্ভুল প্রমাণ পেয়েছি—জীবন-যুদ্ধে তার অসামান্য সাফল্য থেকে। সুরথ এখন মস্ত ধনী ব্যক্তি। আর আমি? ঐ ডিজগবেষণ করেই কাটল জীবনটা।

নতুন প্রতিবেশী

অধ্যাপক শ্রীঅমলকুমার মিত্র

পাশের বাড়ীটা আজ কতদিন হল একদম খালি পড়ে আছে। কোন ভাড়াটে আসার নামটি নেই পাশ দিয়ে হাঁটলে কি রকম গা ছম ছম করে। শ্রীচন্দা ভাবে মনে মনে—শেষ পর্যন্ত বাড়ীটা আবার ভুতুড়ে বাড়ী হয়ে যাবে না তো?

একদিন এক বুড়ী ভদ্রমহিলা এলেন। খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন বাড়ীটাকে। দেখে বেশ পছন্দই হয়ে গেল তাঁর। বাড়ীর মালিককে বল্লেন, "রান্নাঘরটা দিব্বি বড়-সর আছে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। তবে বাড়ীটা বড্ড বড়। এত বড় বাড়ী আমি একা একা সামলাই কি করে?"

এর দুদিন পর এলেন বেশ নাদুস নুদুস, মোটা সোটা এক ভদ্রলোক। সঙ্গে নিয়ে এলেন তিন চারটে কুকুর ভদ্দরলোকের নাকি দারুণ জীবজন্তু পোষার শখ। খোলা মেলা বাড়ীটা তাঁরও দিব্বি ভাল লেগে গেল। কুকুর, বেড়াল, খরগোসগুলো গা হাত পা ছড়িয়ে উঠোনের মধ্যে বেশ আরাম করে খেলতে পারবে। কিন্তু বাড়ীটা যে বড্ড বড়। অত বড় বাড়ী নিয়ে তিনি কি করবেন?

দিনকয়েক যেতে না যেতে খুব সুন্দরী একজন ভদ্রমহিলা এলেন বাড়ীটাকে দেখতে। সঙ্গে ফুটফুটে তিনটি ছেলেমেয়ে। ঘুরে ফিরে দেখলেন। কেমন সুন্দর বাড়ীটা। "কিন্তু সাতটা বিরাট বিরাট শোবার ঘর নিয়ে আমি কি করে বাড়ীটাকে সামলাব"—বল্লেন তিনি বাড়ীর মালিককে

সত্যি, অত বড় বাড়ী। একে সাজিয়ে-গুছিয়ে, ঝাড় পোছ করে, ছিম-ছাম করে রাখা কি আর চারটিখানি কথা!

কিন্তু যে সময়ে শ্রীচন্দা ভাবতে শুরু করল—বাড়ীটাতে আর কোন ভাড়াটেই আসবে না, ভুতুড়ে বাড়ীই হয়ে যাবে বাড়ীটা শেষ পর্যন্ত—ঠিক সে সময়ে "ভাড়া

দেওয়া হবে" সাইনবোর্ডটা হঠাৎ হাওয়া হয়ে গেল, আর ঠেলাগাড়ী বোঝাই করে জিনিসপত্তর আসতে শুরু করে দিল।

আর সেকি সব জিনিস! কি সুন্দর একটা দোলা চেয়ার। বাড়ীতে শ্রীচন্দার দিদিমার যেমনটি আছে—ঠিক তেমনটি। ওটাতে বসে বসে, দুলতে দুলতে, কত মজার মজার খাবারই না দিদিমা সবাইকে রান্না করে খাওয়ান।

আর এল কুকুর রাখার কয়েকটা কি সুন্দর সুন্দর কাঠের বাক্স। কেমন খড়ের গদি আঁটা—বেশ নরম নরম, গরম গরম।

আর শুধু কি কুকুরের বাক্স! তিনটা খাঁচা-ভরা পাখী,—চন্দনা, ময়না, টিয়া। আরও কত নাম-না-জানা সব পাখী। শ্রীচন্দা সবার নাম যদি জানত—কি মজাটাই না হত!

আর এল বেড়ালের ঝুরি, কুকুরের থালা, রং-বেরং-এর মাছে ঠাসা জল টল টল কাঁচের বাক্স।

—"নিশ্চয়ই সেই মোটা সোটা ভদ্দরলোকের জিনিস এসব"—ভাবল শ্রীচন্দা—"সেই যে লোকটি—জীবজন্তু পোষার শখ্ যাঁর দারুণ।"

তারপরেই নামতে লাগল খাটগুলো। দিদিমার জন্য একটু নীচু মতন একটা খাট, মা বাবার জন্য বেশ বড়-সড় আর একটা, আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মাপের আরও তিনটে ছোট ছোট খাট—যেমন শ্রীচন্দার আছে একটি—ঠিক তেমনটি!

ব্যাস!—শ্রীচন্দার আর বুঝতে বাকী রইল না। আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল সে আপন মনে "নতুন যাঁরা আসছেন আমাদের পাশের বাড়ীটাতে—তাঁদের আমি চিনি, দেখেছি আমি সবাইকে। বুড়ী দিদিমা আসছেন—রান্না করতে যিনি ভালবাসেন। মোটা মতন বাবা আসছেন একজন—অনেক পোষা জীবজন্তু নিয়ে। আর আসছেন একজন খুব সুন্দর মতন মা তিনটি ছেলেমেয়ে তার। সাত সাতটা শোবার ঘরই লেগে যাবে ওদের কাজে।"

শ্রীচন্দার আর যেন তর সয় না। কবে আসবেন সবাই? বাড়ীটা কবে গম গম করবে আবার? বড্ড একা একা ছিল বেচারা এতদিন! কবে আবার মনের মত সঙ্গী সাথীতে ভরে উঠবে ওর মন।*

* একটি বিদেশী গল্পের ছায়া নিয়ে লেখা

শ্রীরবিদাস সাহারায়

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

বিটকুল। না, বলবো না। কেন আমার ভালো দিদিকে মারলে? আমি বলবো না।

অলম্বুস। বলবি না? ওরে পুঁচকে, তোর গলা টিপে মারবো।

(গলা টিপে ধরলো—বুড়ীর বেশে নগরলক্ষ্মীর প্রবেশ)

নগরলক্ষ্মী। আহা হা, ঐ দুধের বাছাকে মারছো কেন গা?

অলম্বুস। দুধের বাছা? ও তোমার মত বুড়ীকে চিবিয়ে খেতে পারে।

নগরলক্ষ্মী। আহা, বাছার বুঝি খিদে পেয়েছে।

অলম্বুস। ওর খিদে পাবে কেন? খিদে পেয়েছে আমার। ও ভারী বজ্জাত, একটা জ্যান্ত মানুষকে লুকিয়ে রেখেছে। (বিটকুলের প্রতি) বল্ হারামজাদা কোথায় সে লোকটা?

নগরলক্ষ্মী। আহা, মাত্র একটা লোকের জন্য ওকে এমনভাবে মারছো? আমি তোমাকে সাড়ে চুয়াল্লিশটা লোক এনে দিতে পারি।

অলম্বুস। সাড়ে চুয়াল্লিশটা লোক। কোথায় পাবি তুই? সত্যি বলছিস না মিথ্যা বলছিস?

নগরলক্ষ্মী। সত্যি বলছি গো, সত্যি বলছি। সাড়ে চুয়াল্লিশটা ছেলের জ্বালায়

আমার হাড় ঝালাপালা হয়ে গেল। যদি ওদের খাও আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

অলম্বুস। চল্, ওদের এক্ষুণি খাবো। (বিটকুলকে ছেড়ে এগিয়ে এলো)

নগরলক্ষ্মী। একটু অপেক্ষা করো। ঐ পাহাড়ের ওধারে ওরা বসে আছে। আমি ওদের ডেকে নিয়ে আসছি।

অলম্বুস। বুঝতে পারছি বুড়ী, তুই ফাঁকি দিয়ে পালাবি। তোকে ছাড়বো না, তোর সঙ্গে যাবো। আচ্ছা, ঠিক ঠাক সাড়ে চুয়াল্লিশটা ছেলে আছে তো?

নগরলক্ষ্মী। হ্যাঁ হ্যাঁ, একটাও কম হবে না। আমি ঠিক গুনতে জানি। ছোট বাচ্চাটাকে নিয়ে দু'কুড়ি সোয়া এক গণ্ডা। চলো না, দেখবে।

অলম্বুস। চল্, যদি সত্যি না হয় তাহলে তোর রক্ষে নেই। চল্ আমার যে আর দেরী সয় না।

নগরলক্ষ্মী। হ্যাঁ, চলো বাবা। একটু আস্তে আস্তে চলো। আমি আবার তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারি না।

(নগরলক্ষ্মী ও অলম্বুসের প্রস্থান)

বিটকুল। ও মানুষটা, বেরিয়ে পড়ো, বেরিয়ে এসো শীগ্‌গীর।

(আনন্দ বেরিয়ে এল)

আনন্দ। (রূপাকে মাটিতে দেখে) একি, এর কি হলো?

বিটকুল। ওকে না, দাদু না ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে। (রূপা চোখ মেলে তাকালো) বাঃ, ঐ যে ভালো দিদিমণি চোখ মেলেছে। কি মজা! (রূপা উঠে বসলো) বাঃ, ভালো দিদিমণি উঠে বসেছে!

রূপা। (চোখ মুছতে মুছতে) আমার কি হয়েছিল রে? রাক্ষসটা কোথায় গেছে?

বিটকুল। দাদু না তোমাকে ধাক্কা দিয়ে চলে গেছে। সাড়ে চুয়াল্লিশটা মানুষ খাবে।

আনন্দ। এখন আমি কি করবো বল তো? স্বর্ণ সরোবরের জল যে আমাকে আনতেই হবে।

(রূপা উঠে দাঁড়াল)

রূপা। আমি যে পথ চিনি না। তাছাড়া কোন মেয়েমানুষের সেখানে যাবার অধিকার নেই। কে তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে?

বিটকুল। দিদিমণি, আমি পথ চিনি। আমি নিয়ে যাবো।

রূপা। নিয়ে যাবি তো? সত্যি নিয়ে যাবি?

বিটকুল। আমি কি তোমার কাছে মিথ্যা বলছি? আমি ঠিক নিয়ে যাবো। বেশী দূরের পথ তো নয়।

রূপা। যা বিটকুল, তুই নিয়ে যা দেখিস, রাক্ষসের কবলে যেন না পড়িস।

বিটকুল। না, না, কোন ভয় নেই। আমি ঠিক নিয়ে যাবো আর নিয়ে আসবো। দিদিমণি, তুমি আমাকে গান শোনাবে তো?

রূপা। হ্যাঁ, ঠিক শোনাবো। যা, তুই ভালোয় ভালোয় ফিরে আয়।

বিটকুল। তুমি একটুও চিন্তা করো না দিদিমণি। ও মানুষটা, চলো। (আনন্দের হাত ধরে) হাঁটি হাঁটি পা পা– হাঁটি হাঁটি পা পা—

(নাচের ভঙ্গিতে আনন্দকে নিয়ে চলে গেল)

[রূপা পথের দিকে তাকিয়ে রইল। দূর থেকে গান ভেসে এল]

রূপা। আনন্দ জল নিয়ে ফিরে আসতে পারবে তো? বিশ্বপুর রাজ্য জুড়ে হাহাকার। লোকের মুখে অন্ন নেই, তৃষ্ণায় কেউ জল পায় না। আনন্দ ফিরে গেলেই অঙ্গনা বেঁচে উঠবে···হেসে উঠবে সারা দেশের মানুষ। কিন্তু রাক্ষস যদি আনন্দকে ধরে ফেলে?···না না, আনন্দকে বাঁচাতে হবে। মারতে হবে ঐ রাক্ষসটাকে। আমি জানি তার মরণের সংকেত।

(ভিতরে গিয়ে কৌটা নিয়ে ফিরে এল)

পেয়েছি, পেয়েছি সেই কৌটো। (খুলে) এই যে, তোমরা রয়েছ এর মধ্যে। এতে আছে রাক্ষসের প্রাণ। এটাকে মারলেই রাক্ষস মরে যাবে।

(বাইরে শোনা গেল বিকট শব্দ: অলম্বুস প্রবেশ করলো)

অলম্বুস। ওরে রূপা! কে আমার জীবন ভোমরার কৌটা ধরেছে? আমাকে মারবার জন্যে কে হাত বাড়িয়েছে?

(আনন্দের প্রবেশ)

আনন্দ এই যে নিয়ে এসেছি স্বর্ণ সরোবরের জল।····একি! রাক্ষস!

অলম্বুস। ওরে, তুই স্বর্ণ সরোবরের জল নিয়ে এসেছিস? এই জল নিয়ে তোকে আর ফিরতে হবে না। এই মুহূর্তেই তোকে শেষ করবো।

(আনন্দের দিকে এগিয়ে গেল; রূপা কৌটা থেকে ভোমরাটা বের করলো)

রূপা। সাবধান! আর এগিও না।

অলম্বুস কি বলছিস ?

রূপা। এই দেখো তোমার-মরণ আমার হাতে।

অলম্বুস ওরে সর্বনাশী, তুই আমাকে মারতে চাস ? এ জন্যই কি তোকে মানুষ করেছি ?

রূপা। তুমি আমার বাবাকে খেয়েছ, মাকে খেয়েছ, তার প্রতিশোধ নেবো না ? তোমার মরাই উচিত। তোমাকে মারলে রক্ষা পাবে একটা দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ। তুমি মরো তুমি মরো।

(ভোমরাটাকে পায়ের তলায় ফেলে দিল)

অলম্বুস। হ্যাঁ, আমি মরবো। কিন্তু তার আগে তোদের দু'জনকে খেয়ে মরবো।

(দু'জনকে গ্রাস করতে গেল—কিন্তু টলতে লাগলো)

আনন্দ। (ভয় পেয়ে) রূপা!

রূপা। তোমার কোন ভয় নেই। রাক্ষসের সাধ্য নেই তোমাকে ধরে। এবার তুমি চলে যাও আনন্দ শীগ্‌গির চলে যাও।

আনন্দ। না না, তোমাকে এখানে রেখে আমি যাবো না। তুমিও চলো।

রূপা। না না, তুমি যাও আনন্দ—তুমি যাও।

আনন্দ। কেন তুমি রাক্ষসের দেশে থাকবে—তুমি থাকবে মানুষের রাজ্যে। বিশ্বপুরের লক্ষ লক্ষ মানুষ তোমার জন্য জীবন ফিরে পাবে। বিশ্বপুর শুধু আমার নয়—তোমারও দেশ। চলো রূপা।

(দু'জনে চলতে লাগলো)

অলম্বুস। ওরে! তোরা পালাচ্ছিস ? তোদের ঘাড় মটকে খাবো। ওরে বিটকুল, ওদের ধর্ ওদের ধর্—

(অলম্বুস ওদের ধরতে গিয়ে পড়ে গেল—পর্দা পড়লো)

চতুর্থ দৃশ্য [প্রান্তর—পিপাসায়, ও ক্ষুধায় ক্লান্ত রাজা অলীকচন্দ্র, সঙ্গে তালবাহন ও গুলাচার্য। তারাও ক্লান্ত।]

রাজা। আর পথ চলতে পারছি না। ক্ষুধায় কাতর—পিপাসায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। এক মুঠো অন্ন কেউ দিতে পারো ? দিতে পারো কেউ একটু জল ? অন্ন দিতে না পারো—শুধু একটু জল দাও—একটু জল। পিপাসায় যে মারা যাচ্ছি।

তালবাহন। এখানে কোথায় জল পাবেন মহারাজ ? নদী পুকুর খাল বিল সব

শুকিয়ে গেছে—কোথাও এক ফোঁটা জল নেই। আকাশ অকরুণ নিষ্ঠুর—এক ফোঁটা জলও সে দেয় না

রাজা। ক্ষুধাতৃষ্ণায় আমার ছেলেমেয়েরা মরে গেল—রাণীও মরে গেল। এবার আমার মরার পালা। আর যে চলতে পারছি না। গুলাচার্য তুমি দেখো কোথাও জল পাও কিনা। আমাকে বাঁচাও।

গুলাচার্য। মহারাজ, দেশের অবস্থা সত্যই শোচনীয়। বিশ্বদেব কুপিত হয়েছেন, আর রক্ষা নেই। আপনার পাপেই সোনার রাজ্য ছারখার হয়ে গেল।

রাজা। কিন্তু তোমরাও কি সেজন্য দায়ী নও? আমার তালে তোমরাও তো তাল মিলিয়ে চলেছ।

তালবাহন। আজ্ঞে, তাল মিলিয়ে চলাই তো যুগের ধর্ম। মন্ত্রীর উপযুক্ত কাজই আমি করেছি। সে কাজ শেষ হয়েছে মহারাজ। এখন আমার ছুটি।

রাজা। সেকি! তুমি চলে যাবে মন্ত্রী?

তালবাহন। হ্যাঁ মহারাজ। আপনার সঙ্গে থেকে মরে কি লাভ? আমি স্বেচ্ছায় মন্ত্রীপদে ইস্তফা দিয়ে চলে যাচ্ছি। আমাকে রেহাই দিন মহারাজ—রেহাই দিন।

(প্রস্থান)

রাজা। মন্ত্রী চলে গেল। গুলাচার্য তুমি কি করবে? তুমিও কি আমাকে এই এই অসহায় অবস্থায় ফেলে চলে যাবে?

গুলাচার্য। মহারাজ, শাস্ত্রে আছে—মূর্খং ত্যজতি পণ্ডিতঃ। পণ্ডিত মূর্খকে ত্যাগ করে। আপনি যে মূর্খ তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। অতএব আপনাকে ত্যাগ করাই শ্রেয়।

(প্রস্থান)

রাজা। সবাই আমাকে ত্যাগ করে চলে গেল? রাজ্য গেল, ধন গেল, মান গেল, স্ত্রী পুত্র পরিজন সব গেল। আমি অসহায়—আমি নিঃসম্বল।

(প্রজাদের প্রবেশ)

১ম প্রজা। এই যে আমাদের রাজা। রাজা, আমাদের খাদ্য দাও।

২য় প্রজা। আমাদের বস্ত্র দাও।

১ম প্রজা। আমাদের জল দাও।

২য় প্রজা। রাজা, আমাদের বাঁচাও।

রাজা। আমি রাজা নই, আমি ভিখারী। আমার কিচ্ছু নেই। আমি তোমাদের কাছে অন্ন ভিক্ষা চাই—জল ভিক্ষা চাই। আমাকে তোমরা বাঁচাও।

১ম প্রজা। রাজা, আনন্দকে তুমি বন্দী করলে কেন?

২য় প্রজা। আনন্দের মুক্তি চাই।

রাজা। কেউ আর আমার বন্দী নয়। সবাই মুক্ত। তোমরা আমাকে বন্দী করো।

১ম প্রজা। তুমি দেবদাসীকে পুড়িয়ে মারলে কেন?

২য় প্রজা। কেন সে পাথর হয়ে গেল?

রাজা। বুঝতে পেরেছি, ভগবান বিশ্বদেবের অভিশাপেই এমন হয়েছে। এ অপরাধের আর ক্ষমা নেই। তোমরা আমাকে ক্ষমা করো।

১ম প্রজা। এই পাপ রাজ্যে আমরা আর বাস করবো না। রাজার মুখদর্শন করবো না।

২য় প্রজা। এখানে অন্ন নেই, জল নেই। এখানে কি করতে থাকবো? রাজা, তোমার রাজ্য নিয়ে তুমি থাকো।

(প্রজাদের প্রস্থান)

রাজা। উঃ, আর সহ্য করতে পারছি না। ক্ষুধায় নাড়ি ছিঁড়ে যাচ্ছে। তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে কে আছ, আমাকে এক মুঠো অন্ন দাও। অন্ন না হয় একটু জল দাও। আমি যে মরে যাচ্ছি।...কেউ নেই? কেউ আমাকে বাঁচাবার জন্য এগিয়ে আসছে না? যার কথায় হাজার হাজার মানুষ চলতো—তাকে কেউ এক ফোঁটা জলও দিচ্ছে না। আমি এই রাজমুকুট খুলে দিচ্ছি একটু জলের বিনিময়ে আমি আমার রাজ্য দান করছি। একটু জল দিয়ে আমাকে বাঁচাও।

(বালক বেশী বিশ্বদেবের প্রবেশ)

বালক কে মাঠের মাঝে এমন করে কাঁদছে। ওঃ, তুমি রাজা?

রাজা। না না, আমি রাজা নই। আমি ভিখারী।

বালক। তোমার বুঝি খুব খিদে পেয়েছে—না?

রাজা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, কে তুমি বালক? আমি ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় কাতর। আমাকে একটু খাবার দিতে পারো? একটু জল দিতে পারো?

বালক। এই নাও, দুধ এনেছি। খিদে তেষ্টা সব চলে যাবে। এই নাও, খাও—

(রাজা দুধ পান করলো)

রাজা। আঃ, তৃপ্ত হলাম। কে তুমি বালক, তুমি আমাকে বাঁচালে। কোথায় থাক তুমি?

বালক। আমি এই গাঁয়েই থাকি গো। এখানেই আমার বাড়ি।

রাজা। এই নাও রাজমুকুট। আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যে আমাকে তৃষ্ণায় জল দেবে, আমি তাকে রাজ্য দেবো। এই নাও রাজমুকুট।

বালক। আমি মুকুট দিয়ে কি করবো রাজা? মুকুট কি সবাই পরতে পারে? সবাই কি মুকুটের মান রাখতে পারে?

রাজা। তুমি ঠিক বলেছ বালক। মুকুটের মর্যাদা আমি রাখতে পারিনি। কিন্তু এমন কথা তুমি শিখলে কার কাছ থেকে?

বালক। আমি জানি গো, আমি সব জানি।

রাজা। তুমি জান? বলো, কে তুমি ছদ্মবেশী বালক?

বালক। বলবো না গো, বলবো না। কিছুতেই বলবো না। আমি যে তোমার শত্রু। তোমার শত্রু

(ছুটে প্রস্থান)

রাজা। শত্রু! আমার শত্রু! না না, এ আমার শত্রু হতে পারে না। এ নিশ্চয়ই ছদ্মবেশী বিশ্বদেব।··বিশ্বদেব! তোমার একি করুণা! তৃষ্ণায় আমাকে পানীয় দিলে, ক্ষুধায় দিলে খাদ্য। আমাকে তুমি বাঁচালে। কিন্তু কেন বাঁচালে? আমি যে বাঁচতে চাই না। কেন বাঁচবো। কি নিয়ে বাঁচবো?

(কৃষকদের প্রবেশ)

কৃষক। জল দাও, জল দাও। মারা গেলাম, মারা গেলাম। জল দাও, জল দাও।

(আনন্দের প্রবেশ)

আনন্দ আর ভয় নেই জল আসবে। বিশ্বদেব কৃপা করেছেন। বেঁচে উঠেছে দেবদাসী অঙ্গনা। ঐ যে শোনা যাচ্ছে তার পায়ের নূপুরের ধ্বনি। সে নেচে নগর পরিক্রমা করছে। ঐ যে আকাশ ছেয়ে আসছে মেঘ।

রাজা। আনন্দ, তুমি এসেছ? তুমি এসেছ?

আনন্দ। হ্যাঁ মহারাজ; দেশকে যে রক্ষা করতে পেরেছি এটাই আমার সব চেয়ে আনন্দ।

রাজা। আনন্দ, আমি আর রাজা চাই না, ধন চাই না, কিছু চাই না। পথে পথে

ঘুরে বেড়াবো, মুক্ত বিহঙ্গের মত উড়ে বেড়াবো। তাতেই আমার শান্তি। এই নাও রাজমুকুট। আমি চললাম।

(রাজমুকুট আনন্দের হাতে দিয়ে চলতে লাগল)

আনন্দ। রাজা, রাজা—

রাজা। না না, আমাকে আর ডেকো না—আমাকে আর ডেকো না। (প্রস্থান)

আনন্দ। ঐ যে অঙ্গনা নেচে নেচে যাচ্ছে। আবার হেসে উঠেছে দেশ।

(অঙ্গনা নাচতে নাচতে চলে গেল)

কৃষকগণ। ঐ যে জল আসছে—ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। কি মজা। কি মজা।

আনন্দ। কিন্তু এই মুকুট দিয়ে আমি কি করবো? কোথায় রাখবো এই মুকুট?

(নগরলক্ষ্মীর প্রবেশ)

নগরলক্ষ্মী। আনন্দ, তোমাকেই এই মুকুট ধারণ করতে হবে।

আনন্দ। নগরলক্ষ্মী, তুমি এসেছ? জানি তুমি আসবে। তোমার আশীর্বাদ যে আমার মাথায় রয়েছে।

নগরলক্ষ্মী। আমার আশীর্বাদ সার্থক হয়েছে। দেশকে তুমি রক্ষা করেছ। সত্যিকার তুমি দেশপ্রেমিক। এই মুকুট তোমার শিরেই শোভা পাক।

আনন্দ। এর মর্যাদা কি আমি রাখতে পারবো?

নগরলক্ষ্মী। পারবে—তুমি পারবে। আমি নিজের হাতে তোমার মাথায় মুকুট পরিয়ে দিচ্ছি।

(মুকুট পরিয়ে দিল)

কৃষকগণ। আমাদের রাজা। আমাদের রাজা।

আনন্দ। তোমার আশীর্বাদ আমি মাথা পেতে নিলাম। এ রাজ্যে কোন অত্যাচার থাকবে না—থাকবে না শোষণ। এই মুকুট আমার মাথায় থাকবে না—থাকবে মাটির আসনে—তোমার পায়ের তলায়। আমি হবো জনসাধারণের সেবক। তুমি আশীর্বাদ করো।

[মুকুট নগরলক্ষ্মীর পায়ের তলায় রেখে মাথা নত করলো।]

নগরলক্ষ্মী। আমি আশীর্বাদ করছি—তোমার সংকল্প সার্থক হোক্।

(মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলো)

[যবনিকা পতন]

টুনটুনির মা

রণজিৎ ভট্টাচার্য

* * *

ঝুণ্টুর চোখের সামনেই টুনটুনির ছানাটা মাটিতে পড়ে গেল। কাকটা চীৎকার করতে করতে উড়ে গেল। শুধু মা-টুনটুনি মাথার উপরে উড়তে লাগল। সে কাঁ্যা কাঁ্যা করে চীৎকার করছিল, যেন ছানার শোকে কাঁদছিল।

ঝুণ্টু দৌড়ে গিয়ে ছানাটাকে তুলে নিল। আহা রে, অজ্ঞান হয়ে গেছে। কী দস্যি কাক রে বাবা! ছানাটাকে ঠুকরে ঠুকরে বাসা থেকে ফেলে দিয়েছে। মা বেচারী একা একা কত আর বাধা দেবে। ওই গুণ্ডা ডাকাতটার সঙ্গে কি পারে! ঝুণ্টু দৌড়ে মায়ের কাছে চলে গেল। বলল,—মা, একটু দুধ গরম করে দাও তো। দিদিকে বলল,—দিদি, ছানাটার মাথায় একটু জল চাপড়ে দেনা, অজ্ঞান হয়ে গেছে। আর দাদুর কাছ থেকে একটু ওষুধ এনে দে।

সারাদিন ধরে ছানাটার পরিচর্যা চলল। ঝুণ্টুর যত্নে তার জ্ঞান ফিরল, আলতোভাবে কয়েকবার কিচকিচ করে ডাকল। ঝুণ্টুর আনন্দের সীমা রইল না। সে তার পুতুল ছেলেমেয়েদের কথা ভুলে গেল। ছানাটার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে তাকে অস্থির করে তুলল। সে এবার তার ছোট্ট ডানা দুটো ঝাপটাতে লাগল। আর মা পাখীটা পাঁচিলে বসে কাঁ্যা কাঁ্যা করতে লাগল।

ঝুণ্টু বলল,—দাঁড়া না, তোর গায়ে একটু বল হোক, তোর মায়ের কাছে দিয়ে আসব। আর তোর মাও তেমনি, আমি কি ডাকাতটার মত তোকে মারছি। কিন্তু ছানাটা ঝুণ্টুর কথায় শান্ত হল না, সমানে কিচকিচ করে ডাকতে লাগল আর পাখা ঝাপটাতে লাগল।

বিকাল হল। ঝুণ্টু ছানাটাকে পাঁচিলের কাছে ছেড়ে দিল। সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে ফুড়ুৎ করে মায়ের কাছে চলে গেল। মা-টুনটুনি ছানার ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে কিচকিচ করতে লাগল। একবার যেন ঝুণ্টুর দিকে ফিরে লেজ নাড়তে নাড়তে কি বলল, তারপর ছানাকে ইসারা করে দুজনে ডানা মেলে নীল আকাশে উড়ে গেল।

ঝুণ্টু চুপচাপ তাকিয়ে রইল। মনে হল মা পাখীটা তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে গেল। তার চোখ দুটো জলে ভরে যেতে লাগল।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মরদান মারা গেল। কিন্তু তার ছুঁড়ে দেওয়া বিষ-মাখানো বর্শার লক্ষ্য ব্যর্থ হলো না। টারজানের দিকে শোঁ শোঁ করে এগিয়ে গেল।

আর রক্ষা নেই টারজানের। এবার নির্ঘাৎ মৃত্যু।

কিন্তু হঠাৎ টারজান সরে গেল। সেই বর্শাটা গিয়ে লাগলো মুরসিনের বুকে। সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হলো। এলবার্ট বা টারজান কেউ তাকে রক্ষা করবার সুযোগ পেল না।

মরদানের মৃত্যুর পর সেই জায়গার চেহারাটাই যেন পালটে গেল। মরদানের অনুচরদের উৎসাহ গেল ঝিমিয়ে। টারজানের অনুরাগীর সংখ্যাই এখন বেশী। তাদের হাতে মরদানের অনুচরদের দুর্দশার অবধি রইলো না। মার খেয়ে তারা পালিয়ে গেল।

কিন্তু মুরসিন মারা গেছে—এটাই হলো সব চেয়ে দুঃখের কারণ। পিগমুন চেঁচিয়ে বললো—ওরে মুরসিন, তোর বাচ্চাকে তুই কোলে নিতে পারলি না, আনন্দ করতে পারলি না। হায়, তোর কি কপাল রে!

খবর পেয়ে মুরসিনের বউ ছুটে এলো। ছেলেকে পেয়ে যেমন তার আনন্দ,

স্বামীর মৃত্যু দেখে তেমনি তার দুঃখ। ছেলেকে কোলে নিয়ে বারকয়েক চুমো খেল তারপর মুরসিনের পায়ের কাছে বসে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলো।

ওদেশে মৃতদেহ পোড়াবার বা কবর দেবার কোন ব্যবস্থা নেই। তাই মরদান এ মুরসিনের দেহ সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দেওয়া হলো।

দেখতে দেখতে কেটে গেল কয়েকটা দিন। দ্বীপের মানুষরা একদিন জমায়েত হলো তাদের মরদান মারা গেছে। একজন নতুন মরদান এবার নির্বাচিত করতে হবে। সমাজ নিয়ে বাস করতে হলে একজন মোড়ল চাই। নইলে বিচার শালিস করবে কে? মেনে চলার মত একজন লোক না থাকলে কোন কাজই চলে না।

টারজানের নাম এখন সকলের মুখে মুখে। টারজান—টারজানই আমাদের নতুন মরদান। তাকেই আমরা চাই।

টারজানই ভোটাধিক্যে মরদান নির্বাচিত হয়ে গেল। সবাই তখন উল্লাসে মত্ত হয়ে মিছিল করে গিয়ে হাজির হলো এলবার্টের ঘরের সামনে। সেখানেই এখন টারজানের আস্তানা। জেনি কোলাহল শুনে চমকে উঠলো। দুর দুর বুকে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। এলবার্ট এবং টারজানও বেরিয়ে এলো। প্রথমে কি ব্যাপার তারা কিছুই বুঝতে পারলো না। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই সব ব্যাপার বোঝা গেল। দু'জন যোয়ান লোক এগিয়ে এসে টারজানকে কাঁধে তুলে নাচতে লাগলো।

পিরমুন টারজানের দিকে তাকিয়ে বললো—তুই আমাদের বাচ্চাদের বাঁচিয়ে দিয়েছিস। তুই দ্যাব্‌তা—তুই আমাদের রাজা।

টারজানকে কাঁধে নিয়ে গোটা দ্বীপ তারা পরিক্রমা করলো। আগেকার মরদানের বাসস্থানই হলো টারজানের থাকবার জায়গা।

টারজান এখন দ্বীপের প্রধান। এলবার্ট ও জেনির বন্দীদশা কেটেছে, তারা এখন মুক্ত—স্বাধীন। তবু তাদের মনে দুর্ভাবনা—কি করে এই দ্বীপ থেকে তারা দেশে ফিরে যাবে।

প্রতীক্ষায় দিন কাটতে লাগলো। হঠাৎ একদিন ঘটলো আর এক বিভ্রাট। ধীবর পল্লী থেকে কয়েকজন লোক এসে টারজানের কাছে নালিশ জানালো—রাত্রিবেলা ভূত এসে তাদের পাড়া থেকে একটি নবজাতক শিশুকে নিয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ পর শিশুটির মা এসে হাউ মাউ করে কাঁদতে লাগলো। টারজানের

পা ধরে মিনতি করতে লাগলো—ওরে ছাব্‌তা, ওরে রাজা—আমার ছেলেকে এনে দে। তুই সব পারিস, আমার ছেলেকে তুই বাঁচিয়ে দে।

টারজান বুঝতে পারলো ব্যাপার কি ঘটেছে। মুরসিন আর পিরমুনের ছেলেকে পাওয়া গিয়েছিল বটে কিন্তু এই নবজাত শিশুকে পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। পেলেও হয়তো পাওয়া যাবে তার ছিন্ন মুণ্ডটি।

তবু টারজান ভরসা দিল—দাঁড়াও দেখি কি করতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে সে এলবার্টকে খবর দিল। এলবার্ট তার বন্দুক নিয়ে হাজির হলো টারজানের কাছে।

টারজান বললো—এলবার্ট, তৈরী হও। এখানকার ভূতকে উচ্ছেদ করতে হবে।

টারজান তখনই তার অনুচরদের হুকুম দিল—তোমরা বর্শা নিয়ে তৈরী হও। অন্যান্য লোকদের বললো—তোমরাও বর্শা ও লাঠি নিয়ে দলে দলে আমাদের সঙ্গে চলো। তোমাদের দেশ থেকে ভূত চিরকালের জন্য তাড়িয়ে দেবো।

সাজ সাজ রব পড়ে গেল দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে। টারজান ভূত তাড়াবে সে কথা শুনে সবার মনে কি উৎসাহ। বর্শা হাতে টারজান এবং বন্দুক হাতে এলবার্ট চললো সকলের আগে আগে। কেউ বর্শা কেউ লাঠি নিয়ে হৈ হৈ করে বিরাট দল তাদের পেছনে পেছনে চললো।

বনের মধ্যে সকলে ঢুকে পড়লো। ভল্লুকদের কোথায় আস্তানা তা টারজানের জানা ছিল। সেখানে গিয়ে পৌঁছতেই এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটলো। ছুটোছুটি পড়ে গেল ভল্লুকদের মধ্যে। কিন্তু ছুটো হিংস্র ভল্লুক মরিয়া হয়ে লোকজনের দিকে ছুটে এলো। একটি ভল্লুকের লক্ষ্য এলবার্টের দিকে আর একটি ভল্লুকের লক্ষ্য টারজানের দিকে। এলবার্টের উপর লাফিয়ে পড়বার আগেই তার বন্দুক গর্জে উঠলো। ভল্লুকটি আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লো মাটির ওপর। টারজান এলবার্টকে লক্ষ্য করতে গিয়ে নিজে প্রস্তুত হতে পারে নি। অতর্কিতে ভল্লুকটি তার ওপর লাফিয়ে পড়লো। টাল সামলাতে না পেরে টারজান মাটিতে পড়ে গেল। ভল্লুকটি পড়লো তার দেহের উপর।

এলবার্টের চোখ কিন্তু সেদিকে পড়লো না। তার বন্দুকে আহত ভল্লুকটিকে সামলাতেই সে তখন ব্যস্ত। একটি গুলি খেয়েও ভল্লুকটি মরে নি। শেষ বারের

মরণ কামড় দেবার জন্য সে রুখে এলো। ওদিকে অন্য সব ভল্লুকদের মারবার জন্য বর্শা আর লাঠি হাতে ছুটে চলেছে দলের লোকেরা।

এদিকে টারজানের সঙ্গে শুরু হলো ভল্লুকের প্রচণ্ড লড়াই। হাতাহাতি যুদ্ধ, পশু আর মানুষে। হাতে থেকে বর্শাটি পড়ে গিয়েছিল, টারজান সুযোগ পেয়ে সেটি তুলে নিল এবং অতর্কিতে সেটি বসিয়ে দিল ভল্লুকের বুকে। ভল্লুকটি প্রচণ্ড লড়াই করার পর মৃত্যু বরণ করলো।

ওদিকে এলবার্ট এগিয়ে গিয়েছে আরও দূরে। তার বন্দুকের শব্দ শোনা গেল—গুড়ুম। গভীর বন, গাছের আড়ালে কে কোথায় আছে তা বুঝবার উপায় নেই। দলের লোকেরা উৎসাহ পেয়ে ভল্লুক হত্যায় মেতে উঠেছে। শোনা যাচ্ছে তাদের উল্লাস-ধ্বনি। ইতিমধ্যে আরও দুটি ভল্লুক টারজানের হাতে মারা পড়েছে।

এলবার্টের পাশে ছুটে এসে টারজান দেখতে পেল এলবার্ট একটি ভালুককে মারবার জন্য বন্দুক তাক করেছে। আর ভালুকটি হাত উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বিষণ্ণ মুখে। সেদিকে তাকিয়ে টারজান বললো—এলবার্ট, বন্দুক নামাও।

এলবার্ট বন্দুক নামালো। কিন্তু বুঝতে পারলো না টারজানের এই আদেশের কারণ কি। টারজান কিন্তু চিনতে পেরেছে, এটা সেই ভল্লুকী, যে স্নেহ দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল মুরসিন আর পিরমুনের ছেলেকে।

টারজান সাহস করে এগিয়ে গেল ভল্লুকীর সামনে। ভল্লুকী তাকে চিনতে পেরেছে, কিছুই সে বললো না। টারজান তার মাথায় ও গায়ে হাত বুলালো। ভল্লুকী নীরবে দাঁড়িয়ে সেই আদর গ্রহণ করতে লাগলো। তার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো জল। টারজান বুঝতে পারলো ভল্লুকী কাঁদছে। একটু দূরে টারজান দেখতে পেল একটি ভল্লুক আহত হয়ে ছটফট করছে। এলবার্টের বন্দুকেই তার ঐ অবস্থা ঘটেছে। টারজান বুঝতে পারলো এই ভল্লুকটি একই সঙ্গে এখানে বাস করতো। এই দুটির দয়াতেই বেঁচেছিল মুরসিন আর পিরমুনের ছেলেরা।

কিন্তু যে নবজাতকটিকে কাল রাত্রে হরণ করা হয়েছে সে বেঁচে আছে কি? কে জানে কোন্ ভল্লুক তাকে নিয়ে এসেছে?

এলবার্ট জিজ্ঞেস করলো—এই ভল্লুকীকে এখন কি করবে!

টারজান বললো—একে নিয়ে যাবো আমার সঙ্গে।

এলবার্ট বললো—এটাকে আমায় দান কর টারজান। আমি দেশে রুখনো

যদি ফিরতে পারি তবে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো। এটাকে রেখে দেবো আমাদের দেশের চিড়িয়াখানায়। বনে বাস করেও হিংস্র পশু এমন দয়ালু হয় একথা আমি আগে জানতাম না। পশুও যে মানুষের চেয়ে দয়ালু হয় এটা হবে তার প্রতীক-চিহ্ন।

জঙ্গলের ভল্লুকের দল নির্মূল হয়েছে। এখানকার লোকেরা যাদের ভূত বলে জানতো তারা নিশ্চিহ্ন। শুধু একটি ভল্লুকীই রয়েছে অবশিষ্ট। বুনো লতা সংগ্রহ করে টারজান ও এলবার্ট তাকে বাঁধলো। তারপর ডাকলো তার অনুচর দলের লোকদের।

কিছুক্ষণের মধ্যে সকলে এক জায়গায় এসে জড়ো হলো। একজনের হাতে একটি শিশুর ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ। যে লোকটির সন্তান কাল রাত্রে চুরি হয়েছিল, সে-ই মৃতদেহটি হাতে করে নিয়ে এসেছে। ক্রোধে ও শোকে সে অধীর। টারজান তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো—আর কোনদিন কারুর সন্তান ভূতে নেবে না। তোমাদের দেশ থেকে ভূত নির্মূল করে দিয়ে গেলাম। এবার আমাদের দেশে ফেরার ব্যবস্থা করে দাও। তোমাদের একটি নৌকা উপহার দাও আমাদের। আমরা সেই নৌকায় চড়ে সমুদ্রে পাড়ি দেবো।

টারজানকে ছেড়ে দেবার ইচ্ছা কারুর ছিল না। তবু ছেড়ে দিতে হলো। বড় একটি মাছ ধরার নৌকা তারা টারজানকে উপহার দিল। তাতে এলবার্ট, জেনি আর ভল্লুকী নিয়ে উঠে পড়লো টারজান।

পাড়ে দাঁড়িয়ে দ্বীপের সমস্ত অধিবাসীরা ছলছল চোখে তাদের বিদায় জানালো। টারজান বললো—এলবার্ট, বন্দুক রেখে এবার বৈঠা ধরো। বড়ো সমুদ্রে গিয়ে পড়লে তবেই তো দেশে যাবার জাহাজ পাবে।

শেষ

অরণ্যের সন্ধানে

অমিয়কুমার চক্রবর্তী

পাহাড়ী জঙ্গল। উত্তরে আর পশ্চিমে পাহাড়ের পর পাহাড় শ্রেণীবদ্ধ হয়ে চলে গেছে, দূরের—অনেক দূরের কয়েকটা পাহাড়ের চূড়া তুষারে ঢাকা।

একটা ভল্লুকী, সঙ্গে তার ছোট একটা বাচ্চা। দুধ খাবে বলে বাচ্চাটা কেবলই ঘ্যান-ঘ্যান করছে আর মাকে ঠেলছে শুয়ে পড়বার জন্যে, কিন্তু মা সে-কথায় কান দিচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত মা ভারি বিরক্ত হল। বলল, ধাড়ি ছেলে এখনও যদি মায়ের দুধ খাস তাহলে দাঁত শক্ত হবে কী করে? চল্ মহুয়ার ফুল খাবি।

বাচ্চা বলল, মহুয়া? সে আবার কী? খায়?

খায় না কী রে? ওর চেয়ে ভাল খাবার আর আছে নাকি?

মহুয়া কী জিনিস ভালুকছানা জানে না, কিন্তু সে উইটিবি থেকে উই খেতে শিখেছে, মৌচাক ভেঙে খেতে গিয়ে মৌমাছির কামড় হজম করেছে। মন্দ নয় খেতে, কিন্তু তাই বলে কি মায়ের দুধের মত? দেখা যাক মহুয়া জিনিসটা কেমন।

মা এগিয়ে চলে, আর থেকে থেকে মুখ তুলে নিশ্বাস নেয় জোরে জোরে।

ঐ তারা পৌঁছে গেল একটা মস্ত মহুয়াগাছের তলায়। ওঃ, কত ফুল যে গাছতলায় পড়ে রয়েছে! মা-র দেখাদেখি বাচ্চাটাও দিব্যি সেই ফুল খেতে শুরু করল। বাঃ, চমৎকার খেতে! সত্যিই অপূর্ব!

…একি তার সারা শরীর টলছে কেন অমন করে? আরে, সে যে দাঁড়াতেই পারছে না ভাল করে! পড়েই গেল একবার। এদিকে তার মা কিন্তু দিব্যি খেয়ে চলেছে, কই টলছে না তো! কে জানে, বড় বলেই হয়ত?

এমন সময় সমস্ত বন কেঁপে উঠল থর থর করে। পরমুহূর্তেই একটা হলদে রেখা যেন ছিটকে উঠল একপাশ থেকে। সেই রেখা লক্ষ্য করে ভালুক-মা দেখল, একটা প্রকাণ্ড বাঘিনী লাফিয়ে পড়েছে একটা হরিণের উপর। একটা চিৎকারেরও সময় পেল না, সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়ল হরিণটা। বাঘিনী একটা খুশির গর্জন ছাড়ল!

দিব্যি আরাম করে মহুয়া ফুল খেয়ে চলেছে, এ আবার কী ঝঞ্ঝাট রে বাবা।

হেঁকে উঠল ভালুক-মা—এই, চিল্লাবি না বলছি। খাচ্ছিস, খা চুপচাপ। এই বলে সে চলল-বাঘটার দিকে।

তবে রে। যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। সাক্ষাৎ যমের সঙ্গে ইয়ার্কি? এক থাবায় বদন বিগড়ে দোব তখন দেখবি।

কী বললি, আমার বদন বিগড়ে দিবি তুই, ডোরাকাটা শয়তান। আরও দু-পা এগিয়ে গেল ভালুক-মা।

ব্যস, আর দেখতে হল না। বাঘিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল ভালুক-মার উপর।

তারপর যে ভীষণ লড়াই শুরু হল তার বর্ণনা দেওয়া কঠিন। বাঘিনীর নখের, দাঁতের ধার বেশি, আর ভল্লুকীর চেহারা মস্ত। সমস্ত বন স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখতে লাগল দুই ভয়ঙ্করের এই সংঘর্ষ।

ভল্লুকীর শরীর দিয়ে অঝোরে রক্ত ঝরছে, কিন্তু কেবল একটা প্রচণ্ড থাপ্পড় মারা ছাড়া সে বাঘিনীর কিছুই করতে পারল না। বাঘিনীর মনে হল যেন তার শিরদাঁড়া ভেঙে দু-খানা হয়ে গেছে। বেশ খানিকটা দূরে ছিটকে পড়ল সে।

সামলে উঠে বাঘিনী সমস্ত শরীরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে নিল। নাঃ, কেলে ভূতটা বড্ড বাড়াবাড়ি করছে, এবার ওকে একেবারে খতম করতে হবে। কোন রকমে গলাটা একবার কামড়ে ধরতে পারলে—

বাঘিনীর এই আক্রমণ ভল্লুকী ঠিক সামলাতে পারল না, ছিটকে পড়ল সে। সঙ্গে সঙ্গে বাঘিনী বিকট হাঁ করে তার গলাটা কামড়ে ধরতে গেল।

কিন্তু ভল্লুকী তার বিপদ ঠিক আন্দাজ করেছে। তাই সে উঠে পড়ল, ওদের মিলন হল শূন্যে।

তারপর যে-সব ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটে চলল তার বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব লড়াইয়ের প্রচণ্ড গর্জন একটু একটু করে স্তিমিত হয়ে এল। শেষ পর্যন্ত যখন থেমে গেল, দুই ভয়ঙ্করের রক্তাক্ত প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

এদিকে ভালুকছানার কী হল? বাঘ সে জীবনে দেখে নি; তাই এই সাঙ্ঘাতিক লড়াইয়ে আর দুই যুধ্যমান বীরের হুহুঙ্কারে সে যত ভয় পেয়েছিল হক-চকিয়ে গিয়েছিল তার চেয়ে বেশি। এবার সে এগিয়ে গেল তার মা-র কাছে। স্তনে মুখ দিয়ে দিব্যি টানতে লাগল সে। আঃ, কী মিষ্টি!

কিন্তু কী আশ্চর্য, এত নিশ্চিন্তভাবে তো মা তাকে দুধ খেতে দেয় না। যাই হোক, এসব বাজে চিন্তা; সে এখন খুব আয়েস করে দুধ খাবে।

এমন সময় সে দেখে, একটা বাচ্চা ডোরাকাটা প্রাণী লাফাতে লাফাতে এসে বড় ডোরাকাটাটার উপর পড়ল। সেও দিব্যি তার মা-র দুধ খেতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরেই বাচ্চাদুটো লক্ষ্য করল, আর দুধ পাওয়া যাচ্ছে না। উঠে পড়ল বাঘের বাচ্চা। এতক্ষণে ভালুকছানাটা তার চোখে পড়ল। অবাক চোখে সে তাকিয়ে দেখতে লাগল তাকে। আরে, এটা আবার কে? যা কালো, ঐ ধেড়ে কেলেটারই বাচ্চা হবে নিশ্চয়। ফ্যাঁস-ফ্যাঁস করে উঠল সে।

ভালুকছানাও ততক্ষণে দুধ না পেয়ে উঠে পড়েছে। দুটো বাচ্চা কাছাকাছি হয়ে শুঁকতে লাগল পরস্পরকে। ভালুকছানাটা একটু বড় হলেও বয়সে দুটোই প্রায় সমান। সে বলল, কে তুই? ঐ ডোরাকাটা বিচ্ছিরিটা তোর মা?

এই খবর্দার, আমার মাকে বিচ্ছিরি বলবি না বলছি। তুই তো ঐ কেলে-কুটকুটেটার ছেলে—কথা কইতে লজ্জা করে না?

সঙ্গে সঙ্গে লেগে গেল দুটোতে। কেউ কম নয় কারুর চেয়ে, প্রায় পনের মিনিট ধরে চলল ওদের এই লড়াই। এমন সময় মরা হরিণটার দিকে বাঘের বাচ্চাটার চোখ পড়ল। তাড়াতাড়ি লড়াই ভুলে সে বলল, আয়, খাবি?

ভালুকছানা বলল, দূর ওসব বাজে। খেতে হয় তো আয় এখানে, মহুয়াফুল খাবি। এর কাছে কিচ্ছু লাগে না।

বাঘের বাচ্চা বলল, মহুয়াফুল কি? খাবার জিনিস? আচ্ছা গাধা তো তুই।

ভালুকছানা বলল, খেতে জানিস না তাই বল? এই ছাখ, আমি একসঙ্গে কতগুলো মুখে দিলুম। আঃ!

বাঘের বাচ্চা বলল, জানিস মা কী বলেছে? বলেছে আমরা রাজার জাত, ওসব ফুল ফল গাছপাতা আমাদের খেতে নেই। আমরা খাব হরিণ, শুয়োর, মোষ, সজারু এইসব—ছাখ একগাল মুখে দিয়ে, ঐ ফুল ফল আর ছুঁতেও ইচ্ছে করবে না।

ভালুকছানার কৌতূহল জাগল। ভাবল, আচ্ছা বলছে যখন এত করে, দেখাই যাক এক কামড় খেয়ে। গেল সে হরিণটার কাছে।

এক কামড় মাংস মুখে নিয়েই সে ফেলে দিল থু-থু করে; দূর দূর, মহুয়াফুল আর এই হরিণ? কিসে আর কিসে? তুই একটু মহুয়াফুল মুখে দিয়ে ছাখ।

বাঘের বাচ্চার কিন্তু একটুও ইচ্ছে করছে না হরিণের মাংস ছেড়ে যায় মহুয়া-ফুল খেতে। কিন্তু ভালুকছানা যখন তার কথায় হরিণের মাংস মুখে দিয়েছে, তখন তারও উচিত নয় কি এই মহুয়াফুল একটু খেয়ে দেখা?

থু থু থু থু—আরে রাম রাম, এই জিনিস আবার খায় নাকি? বলিহারি তোর রুচি। বাঘের ছানা চলে গেল হরিণের কাছে।

বাঘের বাচ্চার কাণ্ড দেখে আর কথা শুনে ভালুকছানা হেসেই কূল পায় না। ছুটিতে মনের সাধে খেয়ে চলেছে। যখন পেটে আর একটুও জায়গা রইল না,

ছুটোয় এগিয়ে গেল তাদের মায়েদের কাছে। কী আশ্চর্য, মায়েরা কত ঘুমোবে আজ! একটা অজানা ভয় ওদের মনে উঁকি দিতে লাগল।

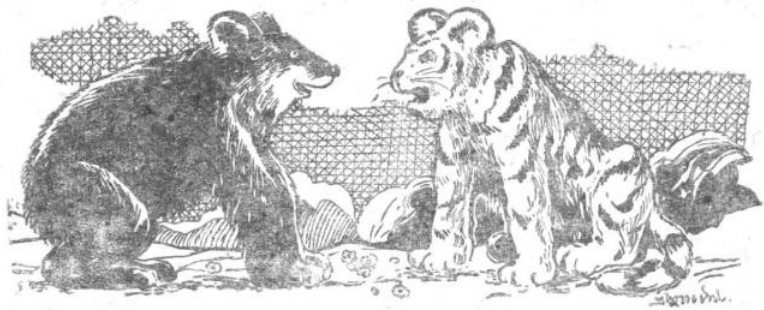

হঠাৎ—ওকি? ওঃ, কী চমৎকার!

চমৎকার জিনিসটা হল একটা হারিকেনের আলো।

কিন্তু হঠাৎ এ কী হল? ওরা আটকা পড়ল যে।

ব্যাপারটা আর কিছু নয়, ওরা গিয়ে পড়েছিল একেবারে বনরক্ষকের ঘরের বারান্দায় চমৎকার জিনিসটা ভাল করে দেখবে বলে, আর বনরক্ষক কখন একটা মস্ত ঝুড়ি এনে পেছন থেকে ওদের চাপা দিয়ে দিয়েছে। বাকি রাতটা তারা বন্দী রইল একটা ঘরের মধ্যে। ব্যাপারটা ওরা কিছুই বুঝতে পারল না।

সকাল হল। ওরা লক্ষ্য করল, একটা উঁচু দু'পেয়ে প্রাণী আসছে ওদের দিকে। আর সঙ্গে সঙ্গে অনেকখানি আলোও এসে লুটিয়ে পড়ল সেই দরজা দিয়ে। একটা ঘটি করে খানিকটা দুধ প্রাণীটা এনেছিল, দুটো বাটিতে ঢেলে দিল সেই দুধ।

কেটে গেল দুটো দিন। অসহ্য, এ জীবন একেবারে অসহ্য! বাঘের বাচ্চা কেমন ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই খানিকটা মায়ের দুধ খেত, তারপর একটা ডন দিয়ে, খুশির আমেজে দৌড়তে দৌড়তে লাফাতে লাফাতে চলে যেত যেদিকে খুশি, যতদূরে খুশি। দূরের বরকান পাহাড়গুলোর কাছে চলে যাবে বলে কতদিন দৌড়েছে, কিন্তু দৌড়তে দৌড়তে লাফাতে লাফাতে বেদম হয়ে পড়েছে। খিদের জ্বালায় তখন তাকে ক্লান্ত হয়েই ফিরতে হয়েছে মায়ের কোলের কাছে।

আর ভালুকছানা ? সে তখন সবে পৃথিবীর সবচেয়ে ভাল জিনিস, মহুয়াফুল খেতে শিখেছে। রাতের শেষে যখন বনের কিনারে টকটকে জিনিসটা দেখা যায়, ভালুকছানা কতদিন মাকে বলেছে ওটা এনে দিতে, আর মা রাজি না হওয়ায় নিজেই গেছে ওটাকে ধরতে। কিন্তু একদিনও নাগালে পায় নি।

ফেলে-আসা জীবনের জন্যে ওদের হা-হুতাশের অন্ত নেই। তাছাড়া, অনেকক্ষণ তো কেটে গেল, এতক্ষণে নিশ্চয় ওদের মায়েদের ঘুম ভেঙেছে। মায়ের কথা মনে হতে আবার সেই অজানা আশঙ্কাটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

সেদিন দুপুরবেলা, ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ্দুর। বনরক্ষকের ছ'বছরের ছেলে অনুপ চারদিকে তাকিয়ে দেখল কেউ কোথায় আছে কিনা, তারপর আস্তে আস্তে গেল যে-ঘরে বাচ্চাদুটো আটকে ছিল সেই ঘরের সামনে।

অনুপের ভারি ভাল লেগেছে বাচ্চাদুটোকে, এর মধ্যে কতবার সে চেষ্টা করেছে ওদের সঙ্গে ভাব জমাতে। কিন্তু বাচ্চা দুটো অমন আটকে থেকে কারুর সঙ্গে ভাব করতে চায় না, তাই প্রতিবারেই তাকে মন খারাপ করে চলে আসতে হয়েছিল। এবার সে ঠিক করেছে ওদের সঙ্গে বনের ধারে গিয়ে খেলা করবে।

বনের পথে বেরিয়ে পড়ল তিনজনে। না, কেউ নেই কোথাও। তার বাবা মা খেয়ে-দেয়ে একটু শুয়েছেন, অন্য লোকজনও কেউ আসে নি এদিকে। তিনটি বাচ্চার কত মজা করে খেলা হল, কত ছুটোছুটি, লাফালাফি, ডিগবাজি খাওয়া।

ছোট্টটি হলে কী হয়, অনুপ জানে বনে অনেক ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর প্রাণী থাকে— সকলেই এই বাচ্চাদুটোর মত নয়। তাই যখন সে কিছুতেই বন্ধুদের সঙ্গে যেতে রাজি হল না, খুব মন খারাপ করে তারা বনের ভিতর চলে গেল অনুপকে বনের কিনারায় রেখে। যাবার আগে বুঝিয়ে গেল, আবার এসে তার সঙ্গে খেলা করবে।

কিন্তু আর তারা আসে নি। নাচতে নাচতে, লাফাতে লাফাতে সেই যে তারা চলল যেখানে তাদের দুই মা শুয়েছিল, তারপর আর তাদের দেখা যায় নি।

কী হল এই দুই বাচ্চার ? কেউ বলতে পারে না। দুগ্ধপোষ্য বাঘ ভালুকের শিশু মা হারিয়ে বাঁচে না বেশি দিন, এরা কতদিন বেঁচে ছিল কে বলতে পারে।

মস্তান শর্মা

শ্রীঅদ্বৈত মল্লিক

বিহারেতে তার দেশ
জেলা দ্বারভাঙ্গা
পালালো সে কলকাতা
করে এক দাঙ্গা।
অতিথি সে হল তার
দেশোয়ালী ভাইয়ার
কলকাতা বাবু হবে
মনে সখ হল তার।
দেশোয়ালী ভাই তার
নিয়ে গেল বাজারে
প্যাণ্ট সার্ট পরে বাবু
হল তার সাজা রে
বগলসী জুতো পায়
চোখে নীল চশমা
মাথায় বাবরি চুল
মস্তান শর্মা
সবকিছু বদলালো
কলকাতা শহরে
ছাড়তে নারিল তবু
খইনির বহরে।
দেখা পেল ছাতুওলা
ফুটপাত চলতে,
বসে গেল থালা নিয়ে
জলছাতু ডলতে
কলকাতা কালচার
হল সব বাইরের
অন্তরে রয়ে গেল
ছাতু খৈনির জের।

কর্ম

কেকা মুখোপাধ্যায়

কর্ম কর কর্ম কর
কর্ম কর ভাই
এ জগতে কর্মবীরের
তুলনা যে নাই।
স্বামীজী তো দেখিয়ে গেছেন
সৎ কর্মের পথ
তাঁরই মত বীর দর্পে
চালাও কর্ম-রথ।
কর্মই যে বড় ধর্ম
সব কর্মের সেরা
সৎ কর্ম দিয়ে জীবন
থাকুক সদাই ঘেরা।

মুক্তা-চয়ন

একবার তাঁহার মাতার স্বাস্থ্যের কথা উঠিলে স্যার গুরুদাস বলিলেন যে যদিও তিনি অতিবৃদ্ধা হইয়াছেন তথাপি তাহার একটিও চুল পাকে নাই কিম্বা একটিও দাঁত পড়ে নাই। যাঁহার নিকট গুরুদাস এই কথাটি বলিলেন তিনি তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা তাঁর কোন ছবি আছে কি?

গুরুদাস বলিলেন, আছে আমার ঘরজোড়া বড় অয়েল পেন্টিং। কেন বলুন তো?

ভদ্রলোক একটু থামিয়া বলিলেন, তাহলে খবরের কাগজে ছাপিয়ে দিতুম।

এই কথা শুনিয়া গুরুদাস জ্বলিয়া উঠিলেন, আমার মায়ের ছবি খবরের কাগজে ছাপিয়ে শেষে কি আমি পাপে ডুববো?

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, পাপ? কি বলছেন আপনি?

গুরুদাস তখন বলিলেন—পাপ নয়তো কি? যে খবরের কাগজে আমার পুণ্যময়ী মাতৃদেবীর ছবি ছাপা হবে, সেই কাগজ তো পরে মসলার দোকান থেকে লোকের বাড়ী যাবে, তারপর সেই মসলার কাগজ রাস্তায় গড়াগড়ি যাবে, তখন কত লোক তার ওপর দিয়ে মাড়িয়ে চলে যাবে।

সংগ্রাহক—শ্রীগোপাল ভৌমিক

শ্রীধর মুন্‌সি

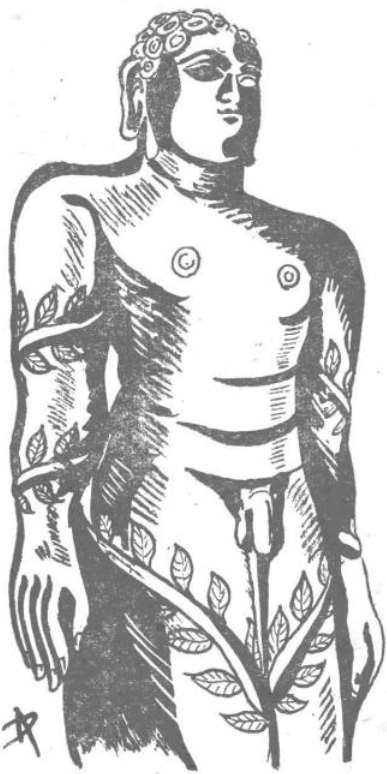

কলিকাতা থেকে বাঙালুর হয়ে মহীশূর। সেখান থেকে বাসে ৬২ মাইল পথ শ্রাবণ বেলগোলা।

অতি সাধারণ গ্রাম। বাস থেকে নামলেই সামনে দুটি পাহাড়। ইন্দ্রগিরি ও চন্দ্রগিরি। ইন্দ্রগিরির উচ্চতা ৪৭০ ফুট। উঠতে কষ্ট হয় না। সিঁড়ি কাটা আছে। ২০০ সিঁড়ির উপরে প্রথম তোরণ। আরো ৬০ সিঁড়ির পরে দ্বিতীয় তোরণ। আরো ১৭৫টি সিঁড়ি পার হয়ে মন্দির তোরণ। তোরণের পাশে একটি পুষ্করিণী। জলটা খুবই নোংরা।

আরো কয়েকটা সিঁড়ি উঠে মূল মন্দির। মন্দির বলতে একটা চতুষ্কোণ অঙ্গন পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। মাঝে বিরাট গোমতেশ্বরের মূর্তি। ৫৭ ফুট উঁচু গ্রেনাইট পাথরের তৈরী দিগম্বর মূর্তি। একখানি পাথরের তৈরী। গোমতেশ্বর দাঁড়িয়ে আছেন একটি ঢিপির উপরে। দুটি মাধবী লতা তাঁর হাঁটু বেষ্টন করে উঠে গেছে কাঁধ অবধি। দৃষ্টি প্রসন্ন, মুখে হাসি।

গোমতেশ্বর জৈন তীর্থঙ্কর।

আট পুরুদেবের দুই পুত্র—ভরত ও বাহুবলী। পুরুদেবের মৃত্যুর পর কে

রাজা হবে তাই নিয়ে দুই ভাইয়ে বিরোধ বাধার উপক্রম হলো। বাহুবলী ভাইকে রাজ্য ছেড়ে দিয়ে বিবাগী হয়ে গেলেন। বহুদিন সাধন ভজন করে তিনি হলেন তীর্থঙ্কর। তিনি যেখানে সিদ্ধিলাভ করলেন মহারাজ ভরত সেখানে এক পাথরের মূর্তি স্থাপন করলেন। স্থানটি তীর্থক্ষেত্র হলো।

তারপর দীর্ঘকালে কত ওলোট পালট হলো। বাহুবলীর মূর্তির চারিপাশে ফনিমনসার জঙ্গল জাগলো। সাপের বাসা হলো। জঙ্গলে সেই মূর্তি দেখে লোকে বলতো কুকুতেশ্বর—ফনিমনসার দেবতা।

অনেক কাল পরে গঙ্গাবংশের রাজা রাজমল্লের মন্ত্রী চামুণ্ড রায় বাহুবলীর মূর্তির সন্ধান করেন, কিন্তু খুঁজে পান না। তিনি নতুন মূর্তি তৈরী করিয়ে এই পাহাড়ের মাথায় স্থাপন করেন ৮৯৩ অব্দে। সেই মূর্তি আজ অবধি অটল। ঝড় বৃষ্টি ভূমিকম্পে ১১০০ বছরেও কিছু হয়নি।

পৃথিবীতে এত বড় মূর্তি আর নেই। মিশর দেশের রামেশিশের মূর্তি এর চেয়ে ছোট।

চারিপাশের চতুষ্কোণ বারান্দায় কয়েকখানি ঘর আছে। সেখানে পাঁচটি তীর্থঙ্করের মূর্তি আছে। তোরণের সামনে আছে ব্রহ্মাদের স্তম্ভ। শীর্ষে ব্রহ্মার মূর্তি।

এখান থেকে নীচের উপত্যকায় জনপদ চোখে পড়ে—গোমতপুরা।

উপত্যকার ওপারে চন্দ্রগিরি। এখানকার ঐতিহাসিক মন্দির চন্দ্রগুপ্ত-বস্তি।

মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে অনাবৃষ্টির ফলে দেশে দুর্ভিক্ষ হয়। রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট—এই কথা বিশ্বাস করে চন্দ্রগুপ্ত পাপ স্খালনের জন্য জৈন সন্ন্যাসী ভদ্রবাহুর সঙ্গে তীর্থ দর্শন করতে বেরোন। শেষে এই শ্রাবণ বেলগোলায় এসে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হলেন। গুহার মধ্যে বসে সাধন ভজন ও ব্রত উপবাস সুরু করলেন। শেষে প্রজাদের দুর্ভিক্ষ-পাপ দূর করার জন্য অনশনে আত্মদান করলেন। সম্রাটের বয়স তখন ষাট বছর হয়নি

সেই গুহার নাম শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহু গুহা। সেখানে ভদ্রবাহুর পদচিহ্ন আছে।

গান্ধার থেকে মহীশূর অবধি যাঁর রাজ্য তিনি হলেন সর্বত্যাগী গুহাবাসী অনশনব্রতী সন্ন্যাসী--এ এদেশেই সম্ভব, এ ইতিহাসের বিস্ময়।

KALARAB
দ্বিতীয় বর্ষ
দ্বাদশ সংখ্যা
Registered No C-190
কার্ত্তিক, ১৩৮১